Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata / Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 1, No.1, *Sravana*, 1363 B.S (1956) – Year 4, No. 3 - 12, 1367 B.S. (1960).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: O.K. / Good. Cover page of *Sundaram* 2nd yr, no. 3 is partially torn.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

নন্দন

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক
সুভো ঠাকুর

লেখক
সজনীকান্ত দাস
হুমায়ুন কবির
গোপাল ভৌমিক
সন্তোষ ঘোষ
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
সাধন চট্টোপাধ্যায়
দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

মূল্য
এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা
কলকাতার বাইরে
ডাক মাশুলের দরুণ
এক টাকা আশি নয়া পয়সা

প্রচ্ছদ-চিত্র
প্রাচীন কাঙরা চিত্রের
প্রতিলিপি
বিচারপতি এ. এন. সেন এর
সংগ্রহ থেকে

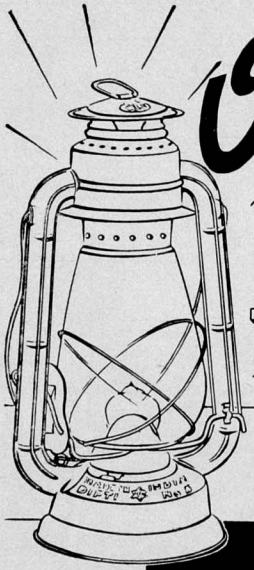

৩টি কারণে

আজ
বেশির ভাগ
লোক কিনছেন

দীপ্তি

কেরোসিন
খরচ কমায়

গভর্ণমেণ্ট প্রশংসাপত্রানুযায়ী প্রতিটী দীপ্তি লণ্ঠন আপনাকে ৬টি বৃটিশ মোম বাতীর সমান আলো দেবে এবং এ আলো ধূম বৰ্জ্জিত হবে।

কখনও
খারাপ হয় না

গঠনে শক্ত ও
মজবুত
দামে সস্তা

আপনি যখনই কোন লণ্ঠন কিনবেন "দীপ্তি" কিনতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন যে "দীপ্তি" লণ্ঠন কিনলে এর কলকব্জা বিগড়োবার ভয় থাকে না। তাছাড়া নূতন "বারণার" আবিষ্কারের ফলে এর কেরোসিন খরচা ২০ ভাগ কমে গেছে। এর গঠন শুধু মজবুত নয় দেখতেও ভারি সুন্দর। জল ঝড় আর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সবরকম ঋতুতেও এর রং সুন্দর থাকে কারণ খুব ভাল আর দামী রং ব্যবহার করা হয়।

দীপ্তি লণ্ঠন
লক্ষ লক্ষ গৃহ
আলোকিত করে

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ, লিঃ

হেড অফিস্: ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফ্যাক্টরী: আগড়পাড়া এষ্টেট

Progressive OM.3.Beng

রূপবাণী ❀ ভারতী ❀ অরুণা-য় !

● ছায়াবাণী পরিবেশনা ●

ভারী দুষ্টু হয়েছে খুকু!

দুষ্টু খুকুকে নিয়ে 'বেচারী মা'-র
ঝামেলার আর অন্ত নেই!
এই খেলাঘরের মা-কে যেদিন
সত্যিসত্যিই এই ঝামেলার সম্মুখীন
হ'তে হবে সেদিনের কিন্তু খুব
বেশী দেরি নেই। সমস্যা-বহুল
সেই ভবিষ্যতের পথকে নির্বিঘ্ন করে
রেখেছেন তার বাবা জীবন-বীমার
ব্যবস্থা ক'রে। যে বীমা-পরিকল্পনা
তিনি গ্রহণ করেছেন তাতে তার
লেখাপড়া অন্যান্য ব্যয় এবং
পরবর্তী জীবনে তার বিয়ের খরচের
ব্যবস্থাও তিনি পাকা করে রেখেছেন।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

LIC-4C BEN

আর—
বাবা দিয়েছেন
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের
পাসবুক

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
হেড অফিস ঃ ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

প্রথম পর্য্যায়

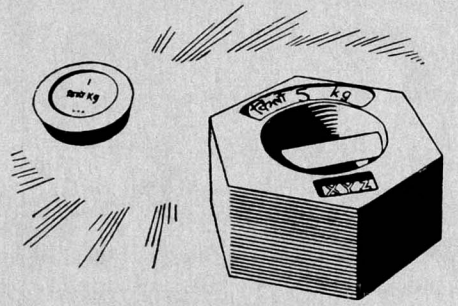

১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ প্রবর্ত্তনের প্রথম পর্য্যায় সুরু হয়েছে। দেশের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় মেট্রিক বাটখারা ব্যবহার আইনসঙ্গত করা হয়েছে।

সরকারী বিভাগগুলিতে এবং সূতীবস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, ভারী রাসায়নিক, কাগজ, সিমেণ্ট ও পাটশিল্পে মেট্রিক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। আস্তে আস্তে সমগ্র দেশে এই পরিবর্ত্তন আনা হবে।

মেট্রিক পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

বর্ত্তমানে প্রচলিত ওজনগুলির মেট্রিক সমতুল জেনে নিন

ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

মেট্রিক ওজনঃ পরিবর্ত্তন তালিকা

(কেটে রাখুন, কাজে লাগবে)

ছটাক (১ ছটাক = ৫ তোলা)	গ্রাম (নিকটতম গ্রাম পর্য্যন্ত)
১	৫৮
২	১১৭
৩	১৭৫
৪	২৩৩
৫	২৯২
৬	৩৫০
৭	৪০৮
৮	৪৬৭
৯	৫২৫
১০	৫৮৩
১১	৬৪২
১২	৭০০
১৩	৭৫৮
১৪	৮১৬
১৫	৮৭৫

মণ (১ মণ = ৪০ সের)	কিলোগ্রাম (নিকটতম কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত)
১	৩৭
২	৭৫
৩	১১২
৪	১৪৯
৫	১৮৭
৬	২২৪
৭	২৬১
৮	২৯৯
৯	৩৩৬
১০	৩৭৩
১১	৪১১
১২	৪৪৮
১৩	৪৮৫
১৪	৫২৩
১৫	৫৬০
১৬	৫৯৭
১৭	৬৩৫
১৮	৬৭২
১৯	৭০৯
২০	৭৪৬

সের (১ সের = ৮০ তোলা)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯

কিলোগ্রাম	গ্রাম (নিকটতম ১০ গ্রাম পর্য্যন্ত)
—	৯৩০
১	৮৭০
২	৮০০
৩	৭৩০
৪	৬৭০
৫	৬০০
৬	৫৩০
৭	৪৬০
৮	৪০০
৯	৩৩০
১০	২৬০
১১	২০০
১২	১৩০
১৩	৬০
১৪	—
১৪	৯৩০
১৫	৮৬০
১৬	৮০০
১৭	৭৩০
১৮	৬৬০
১৯	৬০০
২০	৫৩০
২১	৪৬০
২২	৩৯০
২৩	৩৩০
২৪	২৬০
২৫	১৯০
২৬	১৩০
২৭	৬০
২৭	৯৯০
২৮	৯৩০
২৯	৮৬০
৩০	৭৯০
৩১	৭৩০
৩২	৬৬০
৩৩	৫৯০
৩৪	৫২০
৩৫	৪৬০
৩৬	৩৯০

১ কিলোগ্রাম = ১,০০০ গ্রাম

DA 58/247

ঐক্যের ধারা

কৃষি-নির্ভর ভারতবর্ষ—বর্ষাধারা চিরকাল তার প্রাণস্বরূপা। জীবিকার একান্ত অবলম্বন এই বর্ষা তাই বুঝি প্রভাবিত করেছে তার সঙ্গীত ও কলা, তার সাহিত্য ও লোকাচার, তার সামগ্রিক জীবনকে। রাজস্থানের প্রখর মরুবালুকা বা গ্রাম-বাংলার শ্যামল প্রান্তর—কোথাও বা মেঘরাগে আবার কোথাও বা 'আয় বৃষ্টি ঝেপে' গ্রাম্য ছড়ায় বর্ষার আবাহন হয়। প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক সুগভীর মানসিক ঐক্য এই আবাহনে সুস্পষ্ট। আবহমান কাল প্রবাহিত এই ঐক্যের ধারা সহজ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থায় আজ অধিকতর পরিপুষ্ট।

*

পূর্ব রেলওয়ে

* 'রাগমেঘ'—ষোড়শ শতাব্দীর রাজপুত চিত্রকলার অনুসরণে

LIPTON'S

RED LABEL TEA

A Quality Blend which is cheap at the price

Available in attrcctive i lb & ½ lb cartons

LIPTON (INDIA) LTD. (Incorporated in England)

LRC-2

সুবিধা হারে

যাতায়াত টিকিট

শ্রীনগরের জন্য

নিম্নলিখিত ষ্টেশনগুলি থেকে বরাবর শ্রীনগর পর্যন্ত ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জন্য রেল ও মোটর পথ এবং রেল ও বিমান পথের সংযুক্ত টিকিট এখন সুবিধা হারে পাওয়া যাবে :-

কটক • রায়পুর • টাটা নগর • ওয়ালটেয়ার

রেল ও বিমান পথের সংযুক্ত টিকিট : ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য একবারের ভাড়ার ১⅓ গুণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ১½ গুণ এবং তার ওপর পাঠানকোট-শ্রীনগর বিমান পথের জন্য আরও ৯০৲ টাকা লাগবে। ৩ বছরের বেশী অথচ ১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য এই বিমান পথের ভাড়া হিসেবে ৪৫৲ টাকা নেওয়া হবে, আর ৩ বছরের বা তার কম বয়স্কদের জন্য দিতে হবে ৯৲ টাকা করে।

রেল ও মোটর পথের সংযুক্ত টিকিট : ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য একবারের ভাড়ার ১⅓ গুণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ১½ গুণ এবং তার ওপর পাঠানকোট-শ্রীনগর মোটর পথের জন্য আরও ২৭৲ টাকা লাগবে। ৩ বছরের বেশী অথচ ১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ট্রেনের জন্য অর্ধেক ভাড়া দিতে হবে, কিন্তু মোটর পথের ভাড়া হিসাবে তাদের জন্য দিতে হবে পুরো ভাড়াই, অর্থাৎ ২৭৲ টাকা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

- ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এই টিকিট পাওয়া যাবে
- এই টিকিটের মেয়াদ ৩ মাস
- শুধুমাত্র ফেরার পথে যাত্রা বিরতি করা চলবে—যাওয়ার পথে নয়
- কাশ্মীর প্রবেশের জন্য এখন আর কোন ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না
- সিটি বুকিং অফিসে / এজেন্সীতে এই টিকিট পাওয়া যাবে
- বুকিং অফিস এবং সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি,— হাসি খুসির মেলা

আনন্দ সন্দেশ
কোলে
লাজেন্স
ও
টফী

সুপ্রসিদ্ধ কোলে, KOLAY Kb BISCUITS বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১০

শুভেচ্ছার সহিত

★

টেক্সটাইল মেসিনারী কর্পোরেশন লিঃ

বেলঘরিয়া-২৪ পরগণা

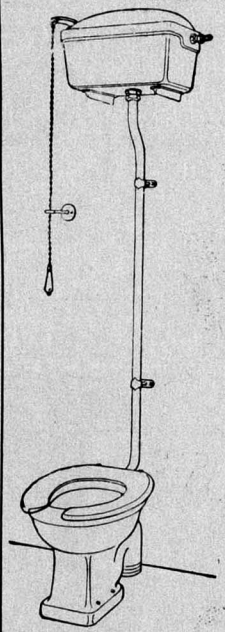

Enjoy Luxurious Comforts with Sanitary installations of the day—

KUMARS' SANITARY EMPORIUM

138, Syama Prosad Mookerjee Road
Kalighat ● Calcutta-26

An establishment dependable,
Homelike & of proved reliability.

When Dunlop first opened an office in Bombay at the end of 1898, there was no fanfare, no handouts, no headlines.

Just about 10 years earlier, John Boyd Dunlop, a veterinary surgeon, had invented the first practicable pneumatic tyre. With the opening of the Dunlop office in Bombay the pneumatic tyre had come to India.

The old century was about to say its quiet farewell. Tagore had not yet started work on "Gitanjali" and Jamsetji Tata was yet to launch his epic search for iron ore. There was nothing, then, of the furious bustle that marks our days.

Soon, very soon, all these were to change as India was caught up in the swift currents of 20th-century history.

Dunlop has moved with the times and in 60 years it has become a familiar and intimate name throughout the country. The Dunlop factory at Sahaganj has grown to become Asia's largest rubber manufacturing enterprise, and this sixtieth year of Dunlop in India is marked by the setting up of a new tyre factory at Ambattur.

From the temple of Agasthyar near Ambattur

the long road to Ambattur

The Dunlop Rubber Co. (India) Ltd.

DC-508

সূচীপত্র

সুন্দরম্। তৃতীয় বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। তেরোশো পঁচাত্তর

সুভো ঠাকুর	সম্পাদকীয়
হুমায়ুন কবির	বরবোদুর
সজনীকান্ত দাস	ত্রয়ী
বোদ্‌লেয়ার	শিল্পীর উত্তর। শঙ্কর দাশগুপ্ত অনূদিত
গোপাল ভৌমিক	বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের শিল্পানুরাগ
বিশেষ প্রতিনিধি	একালের শিল্প-সংগ্রাহক এ. এন. সেন
সন্তোষ ঘোষ	'ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট' প্রবন্ধ সম্পর্কে পত্র ও উত্তর
কল্যাণ দাশগুপ্ত	
সাধন চট্টোপাধ্যায়	পল রোবসন
দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল	জলসাঘর
নিজস্ব সংগ্রাহক	খবরাখবর

অঙ্গসজ্জা : রণেন আয়ণ দত্ত

সম্পাদকীয়

সেদিন সুভো ঠাকুরের সঙ্গে দেখা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম '—' অমুকের সঙ্গে।.....

'গির অরণ্যের' লুপ্তপ্রায় সিংহদের নিয়েই চলেছিল আলোচনা। আলোচনাসূত্রে সুভো ঠাকুর বোললে—"'গির অরণ্যে' বিচরণরত আদত সিংহরা তো শেষ হোয়ে এসেছে, এখন যারা বাকী আছে তারা তো গিরীন্দ্রে বিরাজিত সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ মাত্র। আর বলা বাহুল্য, আজ এদেরই প্রসাদ-পুষ্ট বাংলা সাহিত্য ষোল কলায় পূর্ণ হোতে চলেছে।"

সুভো ঠাকুরের অকস্মাৎ এইরূপ ইঙ্গিতে, সেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকটি ঈষৎ অপ্রস্তুত হোয়ে সলজ্জ হাস্যসহকারে জানালেন "এ যুগে আমরাও যে গর্দভ চর্মাবৃত সিংহ সাজতে বাধ্য হোয়েছি বুঝলে কিনা। তা না হোয়ে উপায়ান্তরই বা কি আমাদের? গর্দভদের সঙ্গে ঠিক মতো গায়ে গা না ঘেঁষাতে পারলে, রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, অন্ননীতি, এমন কি সাহিত্য অবধি কোনটাতেই কক্ষে পাওয়া আজকালকার বাজারে অসম্ভব। গর্দভরাই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ—আর সেই কারণেই তো দেশগৌরব!"

অতঃপর যৎকিঞ্চিৎ স্বগিতান্তে তিনি পুনশ্চ শুরু কোরলেন "শুনলে অবাক হবে সুভো ঠাকুর, ঐ সিংহ চর্মাবৃত গর্দভদের সিংহনাদ শুনতে—টাঁকে দক্ষিণা গুঁজে ত্রিশ হাজার কেন পঞ্চাশ হাজার অবধি ছোট গর্দভেরও সমাবেশ হয়। এমন কি কলেজ ষ্ট্রীট তথা বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট অঞ্চলে অর্থাৎ বই ও বিদ্যার আড়তগুলো যেখানে বিদ্যমান, সেখানে—সেই পীঠস্থানেই বোমা ফাটে—অভ্যর্থনা হয় তাদের! আর তাতে বাংলা-দেশের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র-ক্রোড়ে জননী সরস্বতীর পিলে আতঙ্কে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে থাকে। সেই সুযোগে আমরা, তথা সাহিত্যিকরা, যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা সহ চিত্র-তারকাদের সমগোত্রীয় 'পতাকা-পাব্‌লিসিটি' অর্থাৎ কিনা সিনেমা-জগতে যাকে 'ব্যানার পাবলিসিটি' বলা হোয়ে থাকে তারই লোভে—ও সেই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ গর্দভগোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠালাভের আশায় গর্দভ-গলার নকলে গিট্‌কিরি মেরে নিজেদের গর্দভ প্রমাণে ব্যস্ত। তবে, জেনে রেখো—আদতে ভিতরে ভিতরে এখোনো যে আদত সিংহ, সেই

আদত সিংহই আছি আমরা।"

এরপর বুঝতে বাকী থাকে না কেন সংখ্যালঘু জাত সিংহদের কণ্ঠস্বর আজ রাসভ-কণ্ঠ-নিনাদের আস্তরণ তলে নিতান্তই অস্তমিত।...

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম'—অমুকের মুখ থেকে এইরূপ স্বীকারোক্তির পর স্বভাবতঃই নির্বাক হওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর কি?

তবু সুভো ঠাকুর স্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে এবার বোলে ওঠে "সাহিত্যিকরা সিংহশাবক স্বীকার কোরলাম, কিন্তু তাঁরা সত্যাদর্শের পথ পরিহার কোরে অধুনা ধূর্ত শৃগাল শিশুর ন্যায়—কেবলমাত্র যেন তেন প্রকারেণ, এমন কি নিজেকে গর্দভ-চর্মে আবৃত কোরেও অর্থ ও আত্মরক্ষার নামে অনর্থ ও আত্মপ্রবঞ্চনার পঙ্ক-সাগরে নিমজ্জিত। অতঃপর জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোতের তথা এদেশের জনসাধারণের পথ-প্রদর্শক নেতার ভূমিকায় ভূমিকুমাণ্ডের আবির্ভাব এতই কি অস্বাভাবিক? গর্দভদের সংখ্যাগুরু হওয়ার অন্যতম কারণই তো এই।

"দলাদলির বাজারে সরকারী পিট-চাপ্‌ড়ানির প্রলোভনে চাতক পক্ষীর ন্যায় সাহিত্যিকরা আজ দালালে পর্যবসিত। রঙ-বেরঙের বাগাড়ম্বরের পোষাক-পরিবর্তন-পটু সঙের ন্যায় পরিলক্ষিত সর্বত্র।

"ইদানিং শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্মে প্রণামের পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন পরিহাস লুকোনো থাকে কেন, এবার তার বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে না আশা করি। তবে ইংরেজ আমলের রায় সাহেব, রায় বাহাদুরের ন্যায় অধুনা আমাদের জাতীয় সরকার উচ্চ শ্রেণীর পদ্মশ্রী নামক এক বিচিত্র খেতাবে শিল্পী সাহিত্যিকদের সেই আদর্শচ্যুতির ক্ষতি অনেকখানি পরিপূরণে সচেষ্ট।

"এই ভোট-রঙ্গের যুগে শেষ অবধি প্রতিভার বিচারও ভোটা-ভুটির ভাঁড়ামিতে—প্রহসনে পর্যবসিত। অন্যান্য সরকারী উদ্যোগের ন্যায় এ-ব্যাপারেও দালালী ও চাতুর্যের চাতালে সৃজনী শক্তির সকরুণ মাথা-খোঁড়া দেখে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে আমাদের লোকান্তরিত পূর্বসূরীরাও আজ লজ্জায় অধোবদন।"

সুভো ঠাকুর স্বগতোক্তি সহকারে পুনশ্চ সুরু করে যে—মানুষের ইতিহাসের সূচনা থেকে আজ অবধি 'অসৎ হোতে সৎ-স্বরূপে' নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনাই তো চিরকালের। এর অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম সহজেই সন্দেহের উদ্রেক করে। আর সেই সন্দেহ ঘনীভূত হয় আরও বেশি, যখন দেখা যায় সৎসঙ্গ হোতে অসৎ সঙ্গের উল্টোরথে আরূঢ় সিংহ চর্মাবৃত গর্দভগণ সাহিত্যের কমল বনে মদমত্ত বনজ মোষ লেলিয়ে মজা দেখতে ব্যস্ত। এক্ষণে এদেশ তথা বঙ্গদেশে কলা, কৃষ্টি, সাহিত্য ও শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা যে কিরূপ হওয়া সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়!

ওর মতে, এযুগের সাহিত্যিকরা কোলকাতায় শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত ক্লাবগুলির ন্যায় এক অদ্ভুত মনোবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন। কোলকাতার এই সকল শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত ক্লাবগুলিতে শোনা যায় কৃষ্ণাঙ্গদের স্থান নেই। অর্থাৎ তাঁরা সভ্য শ্রেণীভুক্ত হোতে পারেন না। কোনো শ্বেতাঙ্গ সভ্যের অনুকম্পায় অতিথি হিসাবে তাঁরা আসতে পারেন, খানাপিনা কোরতে পারেন কিন্তু সভ্য শ্রেণীভুক্ত হোয়ে তাঁদের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে এই ক্লাবের ভালো-মন্দের ভাগীদার হওয়ার মত আপত্তি। কিছুদিন পূর্বে খবরের কাগজ মারফত দেখা গেছে এদেশের জনমত এইরূপ বর্ণ-বৈষম্য মনোভাবাপন্ন ক্লাবগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আশ্চর্য হোতে হয়, মর্মাহত হোতে হয়, সৃজনধর্মী শিল্পীদের মধ্যে এই একই সময় ঐ একইরূপ বর্ণ-বৈষম্যের বিসদৃশ মানসিক বৃত্তির অতি নিম্নগামী গতি-ভঙ্গী লক্ষ্য কোরে।

সুন্দরম্-এর বিগত অষ্টম সংখ্যায় এই ব্যাপারে সম্পাদকীয় মন্তব্যে শিল্পীদের তরফ থেকে আবেদন জানান হোয়েছিল যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'রাইটার্স ক্লাব' যাতে 'রাইটার্স ও আর্টিস্ট ক্লাব' নামে অভিহিত হোয়ে শিল্পীদেরও সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং এই ক্লাবের পরিচালনা ব্যাপারেও যাতে শিল্পীরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ কোরতে পারে তার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্যিকদের তরফ হোতে (হয়ত সবাই না হোলেও) রাইটার্স ক্লাব পরিচালনার ব্যাপারে যে সকল প্রকাশক সাহিত্যিকরা এবং তাঁদের মধ্যেও আবার যে সকল সাহিত্যিক-প্রকাশকরা গণতান্ত্রিক

দেশ সফরান্তে সাম্যবাদের দোহাই দেন—বিশেষ কোরে তাঁরাই শিল্পীদের যে আবেদন সম্পর্কে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে উপেক্ষা সহকারে নাকচ্ করেন।

এ বিষয় সুভো ঠাকুর অনুশোচনার সঙ্গে এই কথাই বলে—"শিল্পীরা উপযুক্তরূপে সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ায় আজ তাদের প্রতি এই অবহেলা সম্ভব। শিল্পীরা আজ সঙ্ঘবদ্ধ হোলে এই সব পাব্‌লিসার-সাহিত্যিক রথী-মহারথীরা বুঝতেন—শিল্পীদের সহযোগিতা ভিন্ন আজকালকার মলাট-সর্বস্ব সাহিত্য-সৃষ্টি—তার প্রচার পরিবেশন ও পরিচালনা করা কতখানি দুঃসাধ্য। সত্যি কথা বোলতে গেলে আজ শিল্পীদের দৌলতেই না রবীন্দ্র-উত্তর সাহিত্য দাঁড়িয়ে।"

শিল্পীরা যেমন কথাশিল্পীদের সমগোত্রীয় মনে করেন, সাহিত্যিকদেরও তেমনি শ্বেতাঙ্গ মনোবৃত্তিতে পরিচালিত না হোয়ে শিল্পীদেরও সমগোত্রীয় মনে করাই উচিত নয় কি?

এবার বোধশক্তির সহিত কথাশিল্পীরা যদি শিল্পীদের এই ক্লাবে একাসনে আগীনার্থে আমন্ত্রণ না জানান তবে এই সব সাহিত্যিকদের, বিশেষ কোরে এই সব প্রকাশক-সাহিত্যিকদের পুস্তকগুলির মলাট ও চিত্রাঙ্কণ ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিল্পীরা যেন অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় হন। আর এইটাই শিল্পীদের প্রতি সুভো ঠাকুরের আবেদন, তা হোলেই তাঁদের তথা তথাকথিত সাহিত্যিকদের চেতনা ফেরার সম্ভাবনা। নতুবা অন্য কোনো প্রতিকার আছে বলে মনে হয় না।

* * *

দুশো উনপঞ্চাশ নম্বর বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটে শিল্পী মণি রায়ের সাহায্য-কমিটি স্থাপিত হোয়েছে। শ্রীধরণী গোস্বামী 'পিপল্‌স রিলিফ কমিটী'র অফিসে এই ব্যাপারে একটী সভা আহ্বান কোরেছিলেন। বলা বাহুল্য, শিল্পী মণি রায় বহুদিন যাবত রোগশয্যায়।

আজকাল বহু সাহিত্যিক আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু এ-দেশের স্বাধীন সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকেন। শিল্পী মণি রায়কে সকল রূপ সাহায্যের জন্য সুন্দরম্-এর তরফ থেকে সুভো ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও ভারত সরকারের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ কোরছে।

নিম্নস্তরে কামধাতু লোকে
ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র প্রকাশ,
বর্ণে রূপে রসে গন্ধে জীবনের পরিপূর্ণ ভোগ।
প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতি, বর্ত্তমান বিজয় গৌরব
অনাগত দিনের ইঙ্গিত
পাষাণ অক্ষরে লেখা অমর ভাষায়।

মধ্যস্তরে রূপধাতুলোক।
বুদ্ধি, ধ্যান, মুক্তি-ইচ্ছা লভিয়াছে ললিত বিস্তার
জাতকের অপরূপ চিত্রকলামাঝে।
যোগাসনে বোধিসত্ত্ব তপস্যামগন
জীবনের রাজপথে মৃত্যুদ্বার অতিক্রম করি
সাম্য মৈত্রী করুণার বাণী প্রচারিয়া
সর্ব্ব মানবের লাগি জানিবারে মুক্তির সন্ধান।
মৈত্রেয়ের প্রতীক্ষায় বসুন্ধরা আজিও উদগ্রীব,
গোপার অতৃপ্ত প্রেম লক্ষ নারী বক্ষে কাঁদে আজো।

উর্দ্ধস্তরে অরূপধাতুর
আবির্ভাব প্রত্যাশায় উন্মুখ অন্তর।
রূপাতীত সে অমর্ত্ত্যলোকে
কবির কল্পনা ব্যর্থ পরাজয় মানি।
চিত্রশিল্পী নাহি পায় দিশা,
ভাস্করের শিলামূর্ত্তী ভুলিয়াছে ঐশ্বর্য বিলাস।
সুদীর্ঘ সরলেখা সমাবেশ করি
স্থপতি রচেছে শুধু আভরণহীন
আবরণহীন স্তূপশিখা।
পাষাণের স্থবিরতা ভাঙি।
ছিন্ন করি জড়তার ভার
কৃষ্ণশিলাস্তূপশিখা দীপশিখাসম
উঠে উর্দ্ধপানে।
স্থাপিবারে চাহে
বন্ধহীন সীমাহীন আকাশের সাথে
চির-আত্মীয়তা।

যোগ্যকর্ত্তা, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮

বরবোদুর

হুমায়ুন কবির

চারিদিকে পর্ব্বতের মালা
অর্দ্ধচন্দ্র রহিয়াছে ঘেরি।
তারি কেন্দ্রবিন্দুসম শ্যাম গিরিশিখা
বরবোদুরের ভিত্তি।
শ্যামল ঘাসের আচ্ছাদন
ভেদ করি স্তরে স্তরে ধূসর প্রস্তর আস্তরণ
বিস্তৃত প্রসার হতে ধীরে ধীরে উঠে উর্দ্ধপানে
সঙ্কীর্ণ স্তূপের শিখা।

সজনীকান্ত দাস

প্রাক-বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথের যুগ অবধি যে কজন অঙ্গুলীগ্রাহ্য সমালোচক এসেছেন সজনীকান্ত তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য।

ত্রয়ী

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্গজননীর বিশেষ সন্তান-সৌভাগ্য বহন করিয়া আনিয়াছিল। ওই বৎসরের ১৭ই এপ্রিল কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬এ জুন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ১৯এ নভেম্বর সমাজনায়ক কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বৈষ্ণবাচার্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণও ওই সনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে হিসাব হইতে বাদ দিলেও ১৮৩৮ সন বঙ্গদেশকে ত্রয়ী সন্তান গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছিল বলিয়া স্মরণীয় হইয়াছে।

ঠিক কুড়ি বৎসর পরে ১৮৫৮ সনের নভেম্বর হইতে ১৮৫৯ সনের অক্টোবর পর্যন্ত একবৎসরকাল বঙ্গদেশের পক্ষে অনুরূপ সৌভাগ্যের সূচনা করিয়াছিল। চিন্তা-নায়ক রাজনৈতিক বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৫৮ সনের ৬ই (৭ই?) নভেম্বর, আচার্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ সনের ৩০এ নভেম্বর এবং আচার্য শিক্ষাবিদ্ যোগেশচন্দ্র রায় ১৮৫৯ সনে ২০এ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গমাতার পক্ষে এই কালকে আবার ত্রয়ী গৌরবে স্মরণীয় করিয়াছিলেন। আমরা বর্তমানে ১৯৫৮ সনের ৭ই নভেম্বর হইতে পর পর এই ত্রয়ীকে শতবার্ষিক জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের দ্বারা স্মরণ করিতেছি।

ইঁহারা আমাদের কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনা হইতেছে এবং বৎসরকাল আরও হইবে। আমরা যাহা শিখিয়াছি তাহার পর্যালোচনা করিব এবং যাহা ভুলিয়াছি তাহা পুনরায় স্মরণে আনিবার প্রয়াস করিব। কিন্তু এই বাংলাদেশে আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত যুগে ১৭৭৪ সনে রামমোহন রায়ের জন্ম হইতে উনবিংশ শতকের শেষ বৎসর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিগত এক পাদাধিক শতাব্দী কালে শতাধিক মনীষী ও মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কয়েক বৎসরের তামসি করিয়া আমরা ইঁহাদের আগমন-তিরোধানের কোনও সু-প্রভাব কি বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি? যে নৈতিক ও তথাকথিত সাংস্কৃতিক আবহাওয়া চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে তাহা অনুভব করিয়া আমরা কি অনুমান করিতে পারি—বিগত দেড়শত বৎসরে এই বাংলা-দেশের মাটিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি ধর্ম-প্রবর্তক ও সমাজ-সংস্কারক, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সাহিত্য-নায়ক, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যোগেশচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানবিদ্, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নবগোপাল মিত্র, সুরেন্দ্র-

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বাগ্মী ও চিন্তানায়ক এবং চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি দেশনেতার আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিয়াছে। শুনিয়াছি একেশ্বরবাদী রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই অনুষ্ঠানে শতধা-বিভক্ত পুত্তলরূপে এক ঈশ্বরের লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করিয়া রামমোহন-পুত্র রমাপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন, মহাপুরুষ রামমোহনের আলেখ্য আর এ বাড়ির দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে অপমান করিও না। আলেখ্যটি রাস্তার ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ কর। উনবিংশ শতাব্দীর যে কোনও কৃতি বঙ্গসন্তান আজ যদি বঙ্গদেশে পুনরাবির্ভূত হইতেন তাহা হইলে কি দেখিতেন? তিনি দেখিতেন শতাধিক বর্ষ ধরিয়া উচ্চতম পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী আজ গুরু-ভারে পিষ্ট, প্রপীড়িত ও জ্ঞানবিরহিত। বঙ্গদেশ ও বৃহত্তর বঙ্গ জুড়িয়া ব্যাঙের ছাতার মত গুরু আবির্ভূত হইয়াছেন এবং উচ্চতম রাজকর্মচারী হইতে নিম্নতম পেয়াদা পর্যন্ত, ব্যারিষ্টার-এটর্নী হইতে মোক্তার মুহুরি পর্যন্ত, ধনকুবের ব্যবসায়ী হইতে দরিদ্র ফিরিওয়ালা পর্যন্ত এবং মহিলা কুলের রাণী হইতে চাকরাণী পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বাঙালী সেই গুরুদের পদতলে ইহকাল পরকাল সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। সকলেই আত্মসম্মানবোধ হারাইয়াছেন, কারণ সকলেরই বুদ্ধি জড়তাগ্রস্ত। জীবনের যুদ্ধে পরাজিত বাঙালীর পলায়নী মনোবৃত্তি এমনই প্রবল হইয়াছে যে শৃগালভীত খরগোসের মত তাহারা গুরুবাদের বালুকায় মুখ গুঁজিয়া নির্ভয় হইবার প্রয়াস পাইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর যে বাঙালী মহাপুরুষ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে বাঙালীর এই অধঃপতন দেখিতেন, তিনিও কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত বলিতেন না, যাঁহাদের স্মৃতিপূজা তোমরা করিতেছ, যাঁহাদের শতবার্ষিক উৎসবে বৎসরে বৎসরে তোমরা মত্ত হইতেছ, যাঁহাদের আলেখ্য লোকসভা রাজ্যসভা বিধানসভা বিধান-পরিসদ ও রাজভবনে তোমরা ঘটা করিয়া টাঙাইতেছ, যাঁহাদের মূর্তি গড়িয়া তোমরা পার্কে-উদ্যানে স্থাপন করিবার জন্য হৈ হৈ হল্লা জুড়িয়া দিয়াছ তাঁহাদের আলেখ্য ও মূর্তি দয়া করিয়া যমুনা ও বিদ্যাধরীর কাদায় নিক্ষেপ কর, তাঁহাদিগকে লইয়া আর মাতামাতি করিও না।

যে বাঙালীকে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-ব্রহ্মবান্ধব-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই বাঙালীর কেন এমন দুর্দশা হইল? আখড়ায় আশ্রমে কর্তাভজায় দেশ ছাইয়া গেল কেন? রামমোহন - দেবেন্দ্রনাথ - বিদ্যাসাগর - কেশবচন্দ্র - শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশের শিক্ষিত তরুণ-সম্প্রদায় বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধে সকল যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাথায় পাদুকা প্রহার করিয়া বিশ্বকর্মা-দুর্গা-কালী ও সরস্বতী প্রতিমা লইয়া এমন মাতামাতি বেলেল্লাগিরি করিতে পারিতেছে কেমন করিয়া! স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত-ছাড় আন্দোলন এবং স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাঙালীর কোমর এমন ভাঙিল কেন যাহাতে এরূপ ব্যাপকভাবে গুরু ও গণৎকারের অস্বাভাবিক ঠেকো দেওয়ার প্রয়োজন হইল। লড়াই করিতে করিতে বাঙালী পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া কোণঠাসা হইল কবে?

গত কয়েক বৎসরের পুরাতন ইতিহাস একটু অনুধাবন করা যাক্। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর সুদূর ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের দামামা যেদিন বাজিয়াছিল সেদিন আমরা এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলাম যে, আমাদের স্বাধীনতাপহারী ব্রিটিশ, যুদ্ধে হীনবীর্য হইলে, তাহাদের জোয়াল আমাদের কাঁধ হইতে স্বতঃই খসিয়া পড়িবে। কিন্তু আমেরিকা অচিরাৎ ব্রিটেনের সহিত যোগ দিল এবং জাপানকে শায়েস্তা করিবার জন্য এই বাংলাদেশকে ঘাঁটি করিয়া এমনই পরিবেশের সৃষ্টি করিল যে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বেই আমরা বিপর্যস্ত ও প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গেলাম। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুদ্ধসংক্রান্ত জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকেরা গৃহ বাস্তু ও চাষের জমি হইতে বিতাড়িত হইয়া স্রোতের শ্যাওলার মত সহরের নর্দমা ও আঁস্তাকুড়ে আসিয়া জড়ো হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ও মহামারীর তাণ্ডব শুরু হইল। যুদ্ধাবসানে শ্মশানের সেই পলিমাটির উপরে প্রাণচঞ্চল শ্যামদূর্বাদল ভাল করিয়া মাথা তুলিতে না তুলিতে আত্মকলহপরায়ণ বিভ্রান্ত মানুষের হানাহানি-শোণিতপাতে বাঙালীর অমিত প্রাণশক্তি আবার দমিত

হইল। ভারতবর্ষের বহু-পুরাতন ভিং চিড় খাইয়া একই দেশের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ফাটলের সৃষ্টি করিল এবং এই সর্বনাশের মূল কারণ যাঁহারা তাঁহাদের বুটমণ্ডিত চরণ এই অভিশপ্ত মাটিতে শেষ আঘাত হানিয়া দ্রুত অন্তর্ধান করিল। তাঁহাদের শেষ পাশুপত-অস্ত্র প্রয়োগে এমন ধুন্ধুমারী কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইল যে মানুষ আত্মপর বিস্মৃত হইয়া আত্মঘাতী হইতে লাগিল।

বাংলাদেশের সর্বনাশ-সূচনার ইহা হইল বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্তবিপর্যয়ের ইতিহাস আরও ভয়াবহ, তাহা চোখে দেখিবার নয়, অন্তরে অনুভব করিবার। এই বিপর্যয় শুধু বর্তমানকেই রক্তরঞ্জিত করিয়া ক্ষান্ত নয়, ইহা জাতির ভবিষ্যতকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছে। ভাগ্যবৈগুণ্যে এ দেশের যে সকল মানুষ দুর্ভিক্ষে দুর্বিপাকে এবং আত্মকলহে-আত্মঘাতে মরিয়াছে অথবা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহারা তো গিয়াছেই—তাহাদের জন্য অনুশোচনা ছাড়া কিছু করিবার নাই, কিন্তু যাহারা জাতির ভবিষ্যৎ, যাহারা এই মরা গাঙে পুনরায় বান ডাকাইতে পারে, জাতির সেই তরুণ ও কিশোর দলও রাষ্ট্রের ও সমাজের অব্যবস্থায় পীড়িত ও আহত হইয়াছে, মহাযুদ্ধের বিষক্রিয়া তাহাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগকে স্বধর্মচ্যুত করিতে বসিয়াছে। এইখানেই আমাদের চরম সর্বনাশ সাধিত হইতে চলিয়াছে। ইংরেজ-রাষ্ট্র আপন স্বার্থে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অবহেলা করিয়াছে। যুদ্ধের তথাকথিত জরুরি প্রয়োজনে সর্বত্র শিক্ষা সংকোচ করা হইয়াছে। জাতীয় নেতারা ভাঙার আশু প্রয়োজনে ছাত্রদিগকে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া নিয়োগ করিয়াছেন শৃঙ্খল-ভাঙার দুরূহ কাজে; অন্য শিক্ষার অবকাশ তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। সুখের বিষয় অধিকাংশ নেতার লক্ষ্যও ছিল এক—পরাধীনতার নিগড় হইতে ভারতের মুক্তি। দেশের তরুণ-তরুণীরা বিবিধ আকর্ষণে এই মুক্তিযজ্ঞে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্টের পূর্বে যাহা খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ছিল, ওই স্মরণীয় দিন হইতে তাহাই ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী হইয়া দাঁড়াইল। "ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর্"—ইহাই হইল সর্বভারতীয় ধ্বনি। এই সর্বনাশা মাদকতা তাহাদের যেন পাইয়া বসিল, মহা-উন্মাদনায় কঠিন সহজ হইয়া গেল, গম্ভীর হইল চটুল। যুদ্ধের সৈন্যেরা যেমন প্যারেড গ্রাউণ্ড এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, ইহারাও তেমনই অপর সকল ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ইহার প্রকাশ দেখিলাম বিভিন্ন বিদ্যায়তনে, পাড়ার সরস্বতী পূজায়, সর্বজনীন দুর্গাপূজায়, ফুটবলের মাঠে, ট্রেনে, ষ্টিমারে এবং সর্বাধিক সিনেমাগৃহের টিকিট-ঘরের সম্মুখে। ইংরেজের সহিত যুদ্ধগৌরবে ইহারা এমনই গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল যে, ঘরের মাকে উঠিতে বসিতে চোখ রাঙাইতে লাগিল। কারণে অকারণে হাঁচি কাশি টিকাটিকির অজুহাতে ইহারা ধর্মঘট করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া ধ্বনি আওড়াইয়া মুহুর্মুহু নাগরিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। পড়ার বালাই নাই, পরীক্ষার ভয় নাই, অধ্যাপককে চোখ রাঙাইয়া পার্সেণ্টেজ এবং পরীক্ষার গার্ড ও পরীক্ষককে শাসাইয়া পরীক্ষা পাস ইহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী হইয়া উঠিল। ইহাদের স্বভাব-চাপল্যকেই উস্কাইয়া নিজেদের স্বার্থখাতে প্রবাহিত করিবার জন্য "এলোমেলো ক'রে দে মা"র দলও সবিশেষ তৎপর হইয়া উঠিল। একদিকে শিক্ষার অভাবে ইহাদের ভবিষ্যৎ-জাতিগঠন ও রক্ষণক্ষমতা তো পঙ্গু হইয়া আসিলই, অন্যদিকে নানাভাবে আক্রান্ত হইয়া আমাদের দুর্বল সমাজবন্ধন শিথিল হইতে হইতে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল বিবেকানন্দ, অশ্বিনী দত্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ ব্রহ্মচারীর দল ভাঙিয়া গিয়া কফিখানার "বাঁধ ভেঙে দাও"-এর দল গড়িয়া উঠিল। গীতার বদলে কার্ল মার্ক্স সর্বত্র চালু হইল। ইহার ঢেউ আমাদের অত্যন্ত সংরক্ষণশীল অন্তপুরেও আঘাত হানিল। ঘরে ঘরে মতবিরোধ দেখা দিয়া পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল করিয়া দিল।

বিদায়ী ইংরেজের শেষ চালে ১৯৪৬ ১৬ই আগষ্টের দাঙ্গা বাধিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেই একটা বিপরীতমুখী সংহতির আমদানি করিল। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে—এই নব উচ্চারিত পুরাতন ধ্বনি "এলোমেলো ক'রে দে মা"র দলকে কিছুকালের জন্য যবনিকার অন্তরালে ফেলিয়া দিল। ছেলেরা অসুর-নিধন-যজ্ঞে এবং দেবস্থান রক্ষার কাজে মাতিয়া উঠিল। যে আত্ম-

শক্তির উপর বিশ্বাস তাহারা হারাইয়াছিল, নিজেদের কোনও কাজে নিয়োগ করিবার অবকাশের অভাবে যে হতাশা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছিল, নূতন যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে সেই আত্মশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখিলাম, হতাশার বদলে আশার উদ্দীপনা লক্ষ্য করিলাম। 'আউট অব ইভিল কামেথ গুড'—আত্মকলহের মহাপাপ হইতে আত্মসংহতির মহাকল্যাণ জন্মলাভ করিল। কিছুদিনের জন্য দেশের যুবসম্প্রদায় সম্প্রদায়গতভাবে মানুষের আশা-ভরসার স্থল হইয়া দাঁড়াইল; নেতারা আড়ালে পড়িয়া গেলেন, জল অপেক্ষা রক্তের গাঢ়তার পরীক্ষা হইয়া গেল। ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় বোমা বারুদে হাত পোড়াইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল; সাধারণ শিক্ষার অভাব অসাধারণ শিক্ষার দ্বারা পূর্ণ হইতে লাগিল।

তাহার পর আসিল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শুভ ১৫ই আগষ্ট, ভারতত্যাগী ইংরেজের দয়ায় আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার ও লোকসভা রাজ্য-সভার উল্লেখ করিব না, বাংলাদেশের সিংহাসনেই দেখিলাম, ছায়াগৌরবে আমাদের পরিচিত প্রিয়জনেরাই সগৌরবে আসীন হইলেন। বন্দেমাতরম্ ও জয়হিন্দ ধ্বনির মধ্যেই বহু-আকাঙ্খিত শান্তির প্রতিষ্ঠা হইল; অকস্মাৎ ইংরেজাস্ত্রপ্রসূত ধূম্রজাল অপসারিত হইয়া কলিকাতার তথা বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সুস্থ ও আত্মস্থ হইবার অবকাশ দিল। তাহারা ধীরে ধীরে পরস্পরকে সহিয়া সহিয়া দুর্গাপূজা ও ইদের মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসা ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে মিলিত হইতে লাগিল। নির্বিবাদে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গও বিভাগ হইয়া গেল। ছায়ারা কায়া-গৌরবে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দীর্ঘকাল পূর্বে, অপহৃত সমগ্র জাতির কাম্য স্বাধীনতা প্রায় হস্তামলকবৎ বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হইয়া আশা করিলাম,—পরাধীনতার মধ্যে যাহা হারাইয়াছি—অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, মানুষের মত জীবন যাপনের অধিকার—আমরা আবার তাহা পুনঃপ্রাপ্তির সাধনা করিব। তরুণ তরুণীরা আবার জাতির কল্যাণকর শিক্ষা লাভ করিবে, আমাদের ভাঙিয়া-পড়া সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন আবার দৃঢ় হইবে। আমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া জাতিগঠনের কাজে লাগিব, আমাদের নেতারা সকলে একত্র হইয়া সেই কাজে আমাদের উদ্বুদ্ধ করিবেন। কবিরা জাতির আনন্দবিধায়ক সঙ্গীত ও কাব্য রচনা করিবেন, কথা-শিল্পীরা সরস কাহিনীর মধ্য দিয়া আমাদিগকে মহৎ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাইবেন, চিন্তাশীল মনীষীরা দিবেন বিবিধ সংস্কারের ইঙ্গিত। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন নূতন জাতির জন্য আবার নূতন করিয়া রচিত হইবে, আমাদের নাট্যশালা, আমাদের চলচ্চিত্র, আমাদের যাত্রা পাঁচালী কবিগান, আমাদের কীর্তন আমাদের প্রাণে নূতন দিনের নূতন আশার সঞ্চার করিবে, আমাদের পটুয়া চিত্রশিল্পী ও ভাস্করেরা এই পোড়া দেশকে আবার সুন্দর ও মনোহর করিয়া তুলিবেন, কুটীর-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের কৃষকদের পরিশ্রমলব্ধ ভূমিজাত কৃষিদ্রব্যের পরিপূরক হইয়া দেশের কল্যাণ করিবে, অনাবশ্যক বিলাস-দ্রব্যের প্রচার বাড়াইয়া মানুষের সর্বনাশ যেমন করিবে না, মানুষকে দ্রব্য-উৎপাদক যন্ত্র মাত্রে তেমনই পরিণত করিবে না। শিক্ষায়, জ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে, ব্যায়ামচর্চায়, খেলাধূলায়, এই এতদিনকার পরাধীন পঙ্গু জাতি আবার সবল ও সুস্থ হইয়া রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবে। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষকে মাতৃপূজার যে মন্ত্র দান করিয়াছে সেই মন্ত্রের সফল রূপ দেখাইয়া নূতন গৌরবের পথও দেখাইবে—ইহাই আশা করিয়াছিলাম।

দুঃখের বিষয়, আশাভঙ্গ হইতেও বিলম্ব ঘটিল না। স্বাধীনতার ও'সদ্য মিলনের উল্লাস-বন্যা সরিয়া যাইতে না যাইতে দেখিলাম, জাতির সারাংশে ঘুণ ধরিয়াছে; অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার সর্বনাশী মোহ দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে এমনভাবেই পাইয়া বসিয়াছে যে, শান্ত ও সংযত গঠনের কাজে তাহাদের চিত্তের কোনও স্ফূর্তি নাই। তাহারা উন্মাদনা চায়, উচ্ছ্বাসের বন্যায় ভাসাই অভ্যাস করিয়াছে, সব কিছু ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া চলিবার এমন মারাত্মক প্রবল অভ্যাসের দাস তাহারা হইয়াছে যে, আত্মীয় শুভাশু-ধ্যায়ীকে, আত্মকল্যাণকে পদদলিত করিয়া তাহারা চলিতে চায়, শুধু চলিতে চাওয়া নয়—সেইভাবে চলাই

তাহারা একমাত্র করণীয় বলিয়া মনে করিতেছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, স্বাধীনতা নামেমাত্র অর্জিত হইলেও শত্রুরা এখনও উদ্যত হইয়া আছে এবং অতি নিকটেই তাহারা অবস্থান করিতেছে, শনিরূপে তাহারা অনেকে আমাদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। আমরা সজাগ ও সতর্ক না থাকিলে যে কোনও মুহূর্তে আমাদের সর্বনাশ ঘটিয়া যাইতে পারে।

এই অবস্থায় ১৯৫৮ সনের ৭ই নভেম্বর হইতে দ্বিতীয় ত্রয়ী শতবার্ষিক অনুষ্ঠান বর্ষ কি আমাদিগকে নবজীবন দান করিতে পারিবে? বিপিনচন্দ্রের রাজনীতি ও সমাজ-দর্শন, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-দর্শন এবং যোগেশ-চন্দ্রের আত্মদর্শন কি আবার পথভ্রষ্ট বাঙালীকে সুস্থ ও আত্মস্থ করিতে পারিবে? বিপিনচন্দ্র পুরাতনের ভিত্তির উপর অর্ধমৃত বাঙালী জাতির নবজীবন প্রাপ্তির জন্য তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বাঙালীর সমাজ, ভারতবর্ষের ধর্ম এবং উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করিয়া সেখান হইতেই তিনি নবপ্রাণপ্রদ আহরণ ও বিতরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আপাত চটকদার রক্তাক্ত বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া সকল গভীর চিন্তা ও উপদেশসহ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ১৯২১ সন হইতে আমরা জাতিগতভাবে অন্যায় ও অশুভের সহিত অসহযোগের আত্যন্তিক উৎসাহে কল্যাণকেও প্রতিহত ও বর্জন করিতে বসিয়াছিলাম। বিপিনচন্দ্র আমাদের সেই মত্ততার ভ্রান্তি যুক্তির দ্বারা রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ সেই ভ্রান্তি চরমে উঠিলেও ভুলের মাশুল দিতে আমরা মুহ্যমুহু বিমূঢ় ও চকিত হইয়া উঠিতেছি। আজ বিপিনচন্দ্র নাই কিন্তু তাঁহার বিবিধ রচনার মধ্যে তাঁহার সুচিন্তিত ভাবনা বিধৃত হইয়া আছে। সেই চিন্তাধারা অনুসরণ করিলে আমরা আবার পথের সন্ধান পাইব।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বিভেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি শুধু জড় ও উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের সাযুজ্য-সাম্য দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আমাদের সমাজ-জীবনেও এই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

"পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান সাধনার প্রথমা-বস্থায় একপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সঞ্চিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না। অপরদিকে বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই একেকে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।"

আমরা বিগত কুড়ি বৎসরকাল মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী পরিবেশের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আদর্শ ধরিয়া সংগ্রাম ও বিভেদকেই বরণীয় করিয়াছি। সেই পরবিদ্বেষ এখন অন্তকলহ হইয়া দেখা দিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-শিক্ষার এই দলাদলির উর্ধে উঠিবার ইঙ্গিত আছে।

প্রায়শতায়ু, জ্ঞান-তাপস আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া আমরা কোন পথে চলিতেছি এবং কোন পথ আমাদের শ্রেয় পথ তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে রোগের কথায় তিনি বলিয়াছেন:

"বহুকালের রোগ ভোগে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। বলাধান হইতে সময় লাগিবে। আমাদের সমাজ পরিণামের পথ ধরিতে পারিতেছে না, বিপ্লবের আবর্তে ঘুরিতেছে। পশ্চিমের প্রবল প্রবাহে, পূর্ব ও পশ্চিমের বিমুখী স্রোতে, আবর্ত জন্মিয়াছে। এখন ধৈর্যের সময়, সংযমের সময়। আমাদের শক্তি অল্প; প্রমোদে ও কৃত্রিম উত্তেজনায় সে শক্তিটুকু ব্যয় করিলে বাঁচিতে পারিব না।

"আমরা যে নির্জীব, তাহার নানা লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ, স্ব-প্রত্যয় লোপ। কাজটা ভাল করিতেছি তাহা অন্যের প্রত্যয়ে বুঝিতে হইলে জীবনকে বিক্ কিন্তু সেই দশা অহরহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। আমাদের নিজের প্রত্যয় নাই : বাঁচিয়া আছি কি মরিয়াছি, তাহার বোধ হারাইয়াছি। বড় বড় লোক, দেশে যাঁহাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে, দেখি তাঁহারাও আত্ম-প্রত্যয় হারাইয়াছেন।

"বাঙ্গালী বাহিরে যতই বড়াই করুক, তাহার ব্যবসায়ে তাহার সমবায়ে, কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতেছে না; ব্যবসায়ে টাকা ফেলিতে দশহাত পিছাইয়া পড়িতেছে। এই জাতিগ্লানি স্মরণ করিলে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। কারণ, এইখানেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। অবিশ্বাসের হেতু, কেবল অপটুতা নহে, অপটু হইলেও সত্যপরায়ণকে কে না বিশ্বাস করে? অবিশ্বাসের শিকড় ভাসা-ভাসা নহে, বহু দূরে বহু নীচে চলিয়া গিয়াছে, সমাজরূপ বৃহৎ অট্টালিকার পোতে গিয়া ঠেকিয়াছে। অর্থনীতির সাধ্য নাই সে মূল উৎপাটন করে, 'হা অন্ন' 'হা বস্ত্র' রবে দশদিক বিদীর্ণ হইলেও সাধুশীলতা আপনা-আপনি জন্মিবে না। বঞ্চনায় বিদগ্ধতা প্রকাশ পায়, বাঙ্গালী একটু স্থূলবুদ্ধি হইলে বোধ হয়, বিশ্বাস-ভূমি হইতে পারিত। সমাজ-যন্ত্রের কোথায় কোন কলটা বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহার খোঁজ না লইয়া উপরের চাকায় অগ্নিতপ্ত তৈল নিষেক দ্বারা কি হিত হইবে? যেখানে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সেখানে কে কাকে চোর বলিবে?"

সৌভাগ্যক্রমেই বিপিনচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, এই ত্রয়ীর কেহই নিরাশাবাদী ছিলেন না। তাঁহারা মহাভারত-গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন, বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাও ছিল। বাঙালীর বর্তমান অধোগতি সত্ত্বেও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, বাঙালীর অদম্য প্রাণ-শক্তি আবার তাহার সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবে, সে দুনিয়ার দরবারে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। এই ত্রয়ীর জীবনী ও কীর্তি সম্যক্‌রূপে এই শতবার্ষিক স্মরণের মধ্যে অনুশীলন করিলে আমরা যে বর্তমান বিভ্রান্তি কাটাইয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আশ্বাস লইয়াই 'সুন্দরম্'-এর পাঠকদের নিকট আমাদের ভয়াবহ অবস্থা ও গুরুতর সমস্যার কথা উত্থাপন করিলাম। আচার্য যোগেশচন্দ্রের কিঞ্চিৎ সাবধান-বাণী উদ্ধৃত করিয়া 'ত্রয়ী' প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি। যোগেশ-চন্দ্র বলিতেছেন :

"এ সময় ঔষধ চাই, সুপথ্য চাই। এখন উপহাসের ও উপদেশের সময় নয়; ধীরভাবে সেবার সময়। সমাজ মাত্রেই স্বভাবতঃ রক্ষণশীল—একথা কে না জানে? ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজের সংসর্গে আমাদের চিরপোষিত সংস্কারে আঘাত পড়িতেছে; এমন আঘাত যাহাতে সমাজ-সৌধের মূল পর্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে। অবিরত ভাঙ্গা চলিতেছে, গড়ার দিকে মন নাই। এখন সবাই প্রভু, আজ্ঞাকারী কেহ নাই। বলে, স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তা নষ্ট করিতে পারি না। স্বেচ্ছাচারিতাকে বলে স্বাধীনতা; যেন স্বাধীনতার মধ্যে শাসন থাকে না। স্বেচ্ছাচারীর নিমিত্ত কিন্তু বিস্তীর্ণ অরণ্য পড়িয়া ছিল। সেখানে তিনি বাক্স বাক্স রং, বোঝা বোঝা তুলি লইয়া গিয়া যত ইচ্ছা তত মোহিনীর রূপলাবণ্য হাবভাব লিখিতে পারিতেন; চিত্রে কেহ কালী ঢালিতে যাইত না। গদ্যের ও পদ্যের কলা-কুশলীও গাড়ী গাড়ী কাগজ লইয়া গিয়া মনের সাধে গল্পে ও উপন্যাসে নানা ছন্দে প্রবন্ধে, প্রেমের লুকোচুরি স্বচ্ছন্দে বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন কেহ চুরি করিয়া পড়িতে যাইত না। একদিকে কান্ত-কলার নামে যথেচ্ছাচার অন্যদিকে সমাজের স্বাভাবিক পুরাতনশীল, এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কাব্য দ্বারা যেমন শাস্ত্র, পুরাণ দ্বারা যেমন কাব্য, এবং গীত দ্বারা যেমন পুরাণ লঘু ও হত হইয়া পড়ে, সমাজও লঘু ও হত হইতেছে। ব্যতিব্যস্ত সমাজ নূতন আদর্শ খুঁজিতেছে, যাহাকে সম্মুখে রাখিয়া আত্মলুপ্ত না হইয়া বাঁচিয়া বড় হইতে পারে; কিন্তু কেহ সে আদর্শ নির্মাণে মনোযোগ করিতেছেন না।"

'সুন্দরম্' প্রধানতঃ কান্ত-কলার বাহন তাই এই নূতন আদর্শ নির্মাণের জন্য তাঁহারই দরবারে আবেদন জানাইতেছি। ভাঙার তাণ্ডবের মধ্যেও একপ্রকার সৌন্দর্য আছে কিন্তু গড়ার সংহতির মধ্যে যে সৌন্দর্য তাহারই নাম সত্য, তাহারই নাম শিব এবং তাহাই সুন্দরতর।

শিল্পীর উত্তর

বোদ্‌লেয়ার

রহস্যময় মানুষটিকে প্রশ্ন করি :
কাকে তুমি
সবচেয়ে বেশী ভালবাস,
বাবা, মা, বোন অথবা ভাইকে ?
— বাবা, মা, বোন অথবা ভাই
কেউ নেই আমার।
— বন্ধুকে ?
— এমন একটি শব্দ
তুমি ব্যবহার করলে,
যার অর্থ কখনো আমি জানি নি।
— তোমার স্বদেশকে ?
আমি জানিনা
কোন অক্ষাংশে তার অবস্থান।
— সৌন্দর্য ?
— দেবী অথবা অমরত্ব—
নিশ্চয় আমি
তাদের ভালবাসতে পারতাম।
— সোনা ?
— ঈশ্বরকে তুমি যেমন ঘৃণা কর
তেমনি আমি
ঘৃণা করি সোনা।
— তাহলে
কি তুমি ভালবাস,
হে অপরিচিত
রহস্যময় পথিক ?
— আমি ভালবাসি মেঘপুঞ্জ...
অস্থির
অপরিমাণ
আকাশ ভোরে ভেসে চলা...
উঁচুতে আরো উঁচুতে
স্বর্গ সীমা ছুঁয়ে আসা,
নিরন্তর
পরিবর্তমান
আশ্চর্য অপরূপ ঐ মেঘপুঞ্জ।

অনুবাদ : শঙ্কর দাশগুপ্ত

গোপাল ভৌমিক

কবিতা ও প্রবন্ধ উভয়ই যাঁদের লেখনী সমান সচল, গোপাল ভৌমিক তাঁদের অন্যতম। দৈনন্দিন জীবনের হাসি কান্নার নিরাভরণ প্রকাশ তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। কবিতাগ্রন্থ 'স্বাক্ষর' 'বসন্ত বাহার' ছাড়াও 'সমাজ ও সাহিত্য' প্রভৃতি তাঁর আরও অনেক বই আছে।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের শিল্পানুরাগ

সম্প্রতি আমরা সারা ভারতবর্ষে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ-চন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী পালন কোরেছি। পরাধীন ভারতে নানাবিধ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে যিনি বিজ্ঞান চিন্তার ভিত্তি স্থাপন কোরেছিলেন, স্বাধীন ভারতে তাঁকে স্মরণ কোরে আমরা জাতীয় সত্তারই মর্যাদা দিয়েছি। শতবার্ষিকী উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রের বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের কথা নানাভাবে নানা পত্রিকায় আলোচিত হোয়েছে। আমি এখানে তার পুনরাবৃত্তি কোরতে চাই না। আমি এখানে তাঁর বহুমুখী চরিত্রের অন্য একটি স্বল্প আলোচিত দিকের প্রতি পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরতে চাই। সেটি হলো তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত শিল্পানুরাগ। তাঁর চরিত্রের এই প্রবল শিল্পানুরাগ লক্ষ্য কোরে শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য পত্রান্তরে একটি প্রবন্ধে মন্তব্য কোরে-ছেন : "জগদীশচন্দ্র যদি একজন বড় বিজ্ঞানী না হোতেন তবে একজন বড় শিল্পী হোতেন।" যাঁরা বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তি তাঁদের সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই বোলে থাকি যে তাঁরা জীবনের যে ক্ষেত্রেই কর্মনিযুক্ত থাকুন, সেখানেই নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন। এ উক্তি সব সময় সর্বাংশে সত্য নাও হোতে পারে কেননা প্রতিভা প্রায় ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব আত্মপ্রকাশের পথ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গেই খুঁজে বের কোরে নেয় এবং সেই পথ অনুসরণ কোরেই প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিজেদের সৃষ্টি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে যান মহাকালের বুকে। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক না হোয়ে যদি ঘটনাচক্রে শিল্পকলাকে তাঁর উপজীব্য কোরতেন, তাহলে শিল্পী হিসাবে তিনি বোধ হয় নগণ্য হোতেন না। জগদীশ-চন্দ্রের এমনই আর একটি অবজ্ঞাত দিক হলো তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তাঁর 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন রচনাবলীতে। অর্ধ শতাব্দী কালেরও আগে যখন বিজ্ঞানচর্চাই ছিল ভারতে নতুন, তখন বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার কথা বড় একটা কারও কল্পনায় আসত না। সেই যুগে জগদীশচন্দ্র এমন সাবলীল সুন্দর বাংলায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখেছিলেন যে সে কথা ভাবলে আজও বিস্মিত হোতে হয়। তাঁর 'অব্যক্ত' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন, "তোমার 'অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্ব পরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া অনেকবার ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞান বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ, তবু সাহিত্য সরস্বতী সে গানের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনুবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।"

ধাতব ফলকে আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতিকৃতি।

ভারতীয় শিল্পে অনুপ্রাণিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দির-এর অন্যতম প্রবেশদ্বার।

আচার্য জগদীশচন্দ্র মূলত বিজ্ঞানী হলেও তাঁর চরিত্রে পূর্বকার শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি একটা তীব্র সহজাত আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণই তাঁকে যৌবন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট কোরেছিল এবং উভয়ের গুণগ্রাহিতার মাধ্যমে সে আকর্ষণ রূপ নিয়েছিল অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের। তাঁর চরিত্রের এই যে শিল্পা-নুরাগ, এই যে কবিদৃষ্টি তাই হয়তো তাঁকে অনুপ্রাণিত কোরেছিল জড়বস্তুর প্রাণ অনুসন্ধানে। আচার্য জগ-দীশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার যে উক্তি কোরেছিলেন তার মধ্যেও জগদীশচন্দ্রের এই কবি-সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার বোলেছিলেন : "He was a poet among biologists. Shelley, had he gone on with science, and had he lived in the days of exact measurements, might have shared in his (Bose's) work."

একদিক থেকে দেখতে গেলে কবি ও শিল্পীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য বড় একটা নেই। এঁরা দুজনেই দ্রষ্টা

আচার্যের শিল্পানুরাগের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিজ্ঞান-মন্দিরের দুটি স্থান।

এবং স্রষ্টা। — তফাৎ শুধু উভয়ের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমের। একজনের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হলো লেখা আর অন্য জনের রেখা। তা নইলে শিল্পী-সত্তা উভয়েরই প্রায় এক। জগদীশচন্দ্র যে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ, সেই উনবিংশ শতাব্দী শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্মরণীয়। জ্ঞান,বিজ্ঞান, শিল্প, ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দী জন্ম দিয়েছে বহু উল্লেখযোগ্য মনীষীর। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই যুগটি আরও বিশেষ কোরে স্মরণীয় এই জন্যে যে এটা ছিল পরাধীন ভারতের নবজাগরণের যুগ। ভারতের জাতীয় জীবনে সেদিন দেখা দিয়েছিল বিরাট ভাববিপ্লব এবং তার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল আমাদের শিল্প, সাহিত্য, ও বিজ্ঞান সাধনার উপর। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তখন সৃষ্টি হোয়েছিল তীব্র আলোড়নের এবং সে আলোড়নের ছোঁয়াচ থেকে বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্রও মুক্তি পান নি। বিজ্ঞান সাধনার নামে গজদন্ত মিনার নির্মাণ কোরে তার মধ্যে তিনি একদিনের জন্যেও বাস করেন নি। তাঁর বিজ্ঞান সাধনার পিছনে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন মাতৃভূমির হৃত গৌরব জগৎ সভায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা ও বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করা। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র যে কত বড় স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন তার পরিচয় পাই নিম্নোদ্ধৃত তাঁর নিজেরই রচনাংশ থেকে, "যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।"

বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্রের এই বহুমুখী চরিত্রের কথা যখন ভাবি তখন সত্যই বিস্মিত হোয়ে যেতে হয়। একই সঙ্গে একই লোকের চরিত্রে কি কোরে এমন বিচিত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমন পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর সমাবেশ হয়? বিশেষ কোরে বর্তমানে আমরা যে ব্যক্তিত্বের যুগে বাস কোরছি সে যুগে এরূপ মানুষের উপস্থিতি প্রায় অবিশ্বাস্য বলে পরিগণিত হোতে চলেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় নবজাগরণের দিনে এরূপ মানুষের আবির্ভাব বিস্ময়কর ছিল না—বরং তা যেন

অনেকটা প্রত্যাশিতই ছিল। সে যুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হোয়ে যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হোয়েছিল তাঁদের অনেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকে নতুন কোরে মাতৃভূমিকে ও তার জীবনাদর্শকে বোঝার প্রয়াস কোরেছিলেন—চেষ্টা কোরেছিলেন ভারতীয় জীবনাদর্শে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে। ভারতীয় জীবনাদর্শের সেই মূল কথা কি? সেই মূল কথা পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন—মনুষ্যচরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পাই, দেখতে পাই জগদীশচন্দ্রের মধ্যেও। তাই একজন কবি হোয়েও ভাবলোকে সতত বিচরণ করা সত্ত্বেও বাস্তব জীবন ও তার সমস্যাকে মুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি আর একজন জড়বস্তুর মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণে আত্মনিয়োগ কোরেও ভোলেন নি দেশের সাহিত্য ও শিল্পকলাকে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মধ্যে যে শিল্পানুরাগ ও সৌন্দর্যবোধ পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল তার প্রমাণ আজও ছড়িয়ে আছে তাঁর বাসভবন ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সর্বত্র।

যৌবনে জগদীশচন্দ্র যখন বনটাঁড়াল ও লজ্জাবতী লতা নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিরত ছিলেন তখন বাংলার সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও চলেছিল নতুন বৈপ্লবিক আন্দোলন। বলা বাহুল্য এই উভয় আন্দোলনেরই স্নায়ুকেন্দ্র ছিল ঠাকুর বাড়ি। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র কোরে এই ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ঐকান্তিক যোগাযোগ ঘটেছিল জীবনের প্রথম থেকে এবং বলা বাহুল্য সে যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত ছিল সমান অক্ষুণ্ণ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "On the edges of time" বোলে সম্প্রতি ইংরেজিতে স্মৃতিকথা প্রকাশ কোরেছেন তাতে তিনি এই যোগাযোগের কথা আলোচনা কোরেছেন। এই গ্রন্থে দেখা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঠাকুর বাড়ীতে 'খামখেয়ালী সভা' নামে যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হোয়েছিল তার অন্যতম উৎসাহী সদস্য ছিলেন জগদীশচন্দ্র। আজকের দিনে আমাদের সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে যেরূপ বিভেদ বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে তার ফলে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে মিল নেই বোললেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যিকরা যদি কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন সেখানে শিল্পীদের দেখা পাওয়া যায় না, শিল্পীদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে খুঁজে পাওয়া যায় না সাহিত্যিকদের। বর্তমান যুগে হোলে জগদীশচন্দ্র 'খামখেয়ালী সভা'র মত কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হোতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় জাগে। সৌভাগ্যের বিষয় শিল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। শিল্পকর্মের মাধ্যমে যাই হোক না কেন তিনি সকল প্রকার শিল্পকর্মের মূলগত-ঐক্য সম্বন্ধে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। তাই তিনি 'খামখেয়ালী সভা'র মাধ্যমে সে যুগের সর্বপ্রকার সংস্কৃতিকর্মীর এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এই 'খামখেয়ালী সভা'র সদস্যগোষ্ঠীতে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা, সংগীতজ্ঞ প্রভৃতি। জগদীশচন্দ্রও ছিলেন এই গোষ্ঠীর একজন সম্মানিত সদস্য এবং তিনি এ সভায় আলাপ আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ কোরতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মুখে 'এসো এসো ফিরে এসো' নামক গানটি বারম্বার শুনেও পরিতৃপ্ত হোতেন না। সুযোগ পেলেই তিনি কবির মুখ থেকে এ গানটি শুনতে চাইতেন। জাতীয় শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রের যে প্রীতি তা এইভাবে ঠাকুর পরিবারের মাধ্যমে উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি হোয়েছিল। ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে ঠাকুর পরিবারের অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের দান সর্বজনবিদিত। এঁরা এবং আচার্য নন্দলাল বসু প্রমুখ এঁদের শিষ্যরা ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে যে প্রয়াস কোরেছিলেন জগদীশচন্দ্র তার সঙ্গে প্রথমাবধি পরিচিত ছিলেন। এই শিল্পী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সৌহার্দ্যও সৃষ্টি হোয়েছিল। এই সৌহার্দ্য পরবর্তী যুগে আরও পরিপুষ্ট হোয়েছিল 'বিচিত্রা' ক্লাবের মাধ্যমে। 'বিচিত্রা'র সৃষ্টি হোয়েছিল ১৯১০ সালে এবং এর পিছনেও প্রধান প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রনাথের। 'বিচিত্রা'র সদস্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণী সংস্কৃতিকর্মী। ই, বি, হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের

যোগাযোগ এবং প্রায় সেই সময়েই সমকালীন শিল্পী-গোষ্ঠির উপর সুপ্রসিদ্ধ জাপানী পণ্ডিত কাউন্ট কাকুজো ওকাকুরার প্রভাব থেকেই জন্ম নিয়েছিল নতুন ভারতীয় শিল্পকলা। কাউন্ট ওকাকুরার "Ideals of the East" নামক গ্রন্থ সে সময়ে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার কোরেছিল এবং ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির পুনরুজীবনে প্রভূত সহায়তা কোরেছিল। কাউন্ট ওকাকুরা এতেই সন্তুষ্ট থাকেন নি। ভারতীয় শিল্পীদের পথ নির্দেশে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তিনি জাপান থেকে দুজন খ্যাতনামা শিল্পীকেও নিয়ে এসে-ছিলেন কোলকাতায়। ভারতীয় শিল্পের এই নব আন্দোলন সার্থক রূপ পরিগ্রহ কোরেছিল 'বিচিত্রা'কে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য যে বিজ্ঞান-সাধক জগদীশ-চন্দ্র এই নতুন শিল্প-গোষ্ঠীকে অন্তরঙ্গভাবেই জানতেন এবং তাঁদের প্রয়াসের পিছনে ছিল তাঁর পূর্ণ সমর্থন। এই শিল্পানুরাগের পরিচয় জগদীশচন্দ্র রেখে গেছেন তাঁর স্বনির্মিত বাসভবন ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সর্বত্র।

আজীবন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক হোয়েও জগদীশচন্দ্র তাঁর সৌন্দর্য বোধ ও শিল্পানুরাগকে স্তিমিত হোতে দেননি তার প্রথম পরিচয় মেলে তাঁর নিজের বাসভবনে। ভারতীয় শিল্প সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর যে অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, তার পরিচয় তাঁর বাসগৃহের গঠনরীতির মধ্যে তো পাওয়া যাবেই, গৃহের সাজ-সজ্জা ও দেওয়ালচিত্রের মধ্যেও সুস্পষ্ট। বাসগৃহে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ে বাড়ির সম্মুখে কালো পাথরে তৈরী কৃত্রিম পাহাড় এবং সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে একটি নদী। সেই ছোট নদীর উপর পারাপারের জন্যে একটি ছোট বাঁশের সেতুও আছে। এই পাহাড় এবং নদী জগদীশচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এ দৃশ্য দেখলে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানের' অবিস্মরণীয় লেখককে; 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ' ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই, 'মহাদেবের জটা হইতে।' এই কৃত্রিম পাহাড় ও নদী অজন্তা গুহামন্দিরের চিত্রের অনুকরণে তৈরী করানো হোয়েছিল। কৃত্রিম নদীটির ওপারে সংরক্ষিত আছে জগদীশচন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত একাধিক দুষ্প্রাপ্য মূর্তি। একটি মূর্তি বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীতে প্রাপ্ত—সূর্য দেবের মূর্তি—সম্ভাব্য নির্মাণ-কাল দশম থেকে একাদশ শতাব্দী। আর একটি মূর্তি আছে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় শিরহীন উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের—সম্ভাব্য নির্মাণকাল একাদশ শতাব্দী। জগদীশচন্দ্রের বাসভবনে ঢুকলে প্রথমেই পাওয়া যায় তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানা সেখানে বসে তিনি দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা কোরতেন। শিল্পকলার প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগের ছাপ এ বৈঠকখানাটির সর্বত্র সুপরিস্ফুট। বৈঠকখানাটির উত্তর দেয়ালে আঁকা আছে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের মাতৃমূর্তি বা ভারতজননীর চিত্র—তাঁর চার হাতে খাদ্য, বস্ত্র, বিদ্যা ও ধর্মের প্রতীক। ঘরটির চারদিকে ছাদ ও দেয়ালের সংযোগ স্থলে সেগুন কাঠের উপর আঁকা শিল্পী নন্দলালের মহাভারতের কাহিনী এবং অজন্তার গুহাচিত্রের অনুকরণে বুদ্ধদেবের জীবনের কাহিনী। মহাভারতের কাহিনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হোয়েছে মানব জীবনের সেই চিরন্তন সমস্যা—জীবনের সংগ্রাম ও শান্তি। একদিকে দেখা যায় কুরু পাণ্ডবের দ্যূতক্রীড়ার দৃশ্য—তাঁর একপাশে বাজি হিসাবে রাখা আছে রাজমুকুট আর অন্য পার্শ্বে যুদ্ধায়োজন এবং অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ প্রচারের দৃশ্য 'ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ'। দেওয়ালের আর একদিকে দেখানো হোয়েছে যুদ্ধশেষের অবস্থা—বিজয়ী পাণ্ডব ভ্রাতারা গালে হাত দিয়ে বিমর্ষ-চিত্তে বসে আছেন, এক পাশে চলেছে বিজয়োৎসব আবার তারই পাশে শ্মশানের ভয়াবহ দৃশ্য, বিধবা নারীদের করুণ আর্তনাদের চিত্র। পশুপাখীর চিত্রের মাধ্যমে এই জীবন সংগ্রামের দৃশ্য তুলে ধরা হোয়েছে—আছে ষাঁড়ের লড়াই, হাতির লড়াই, পাখীদের প্রভাত কূজন ও সন্ধ্যাবেলায় কুলায়ে প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য। একদিকে দেখানো হোয়েছে পাখিদের জলকেলিতে উদ্বেল একটি জলাশয়ের দৃশ্য এবং অপরদিকে রয়েছে প্রস্ফুটিত পদ্মে পরিপূর্ণ শান্ত জলাশয়ের একটি চিত্র। জীবনের সমস্ত সংগ্রামের শেষ কথা এই অখণ্ড শান্তি! শিল্পাচার্য নন্দ-লালের তুলিতে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনাদর্শই যেন ফুটে উঠেছে তাঁর বৈঠকখানার দেয়ালের গায়ে।

ভিতরে কত বড় শিল্পানুরাগ থাকলে নিজের বৈঠক-খানাকে এভাবে ইঙ্গিতময় শিল্পকলা দিয়ে সাজানো যায়—সেকথা সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়াও বৈঠকখানার দেয়ালের গায়ে ঝোলানো আছে প্রসিদ্ধ শিল্পীদের আঁকা কয়েকখানি চিত্র। এই চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অবনীন্দ্রনাথের আঁকা রবীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্র-নাথের আঁকা তিনখানা চিত্র। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলির মধ্যে একটি হলো মন্দিরের পথে তীর্থ-যাত্রীদের যাত্রার দৃশ্য, একটিতে বালক জগদীশচন্দ্রকে ত্রিপুরার মহারাজ কর্তৃক উপহার হিসাবে প্রদত্ত সুন্দর একটি পাটির কাজ। তাতে মন্দির প্রভৃতির দৃশ্য সুন্দরভাবে অঙ্কিত কাঠের উপর সোনালী রঙে আঁকা একটি চৈনিক বা ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্তিও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালো রঙের দুটি হাতির উপরে একটি কাঠের বসার আসনও গৃহস্বামীর সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পানুরাগের পরিচয় দেয়। লেডী অবলা বসুর লেখার ঘরে রক্ষিত আছে শিল্পী অতুল বসুর আঁকা জগদীশচন্দ্রের একটি বড় তৈলচিত্র। বারান্দায় যেখানে জগদীশচন্দ্রের চা-

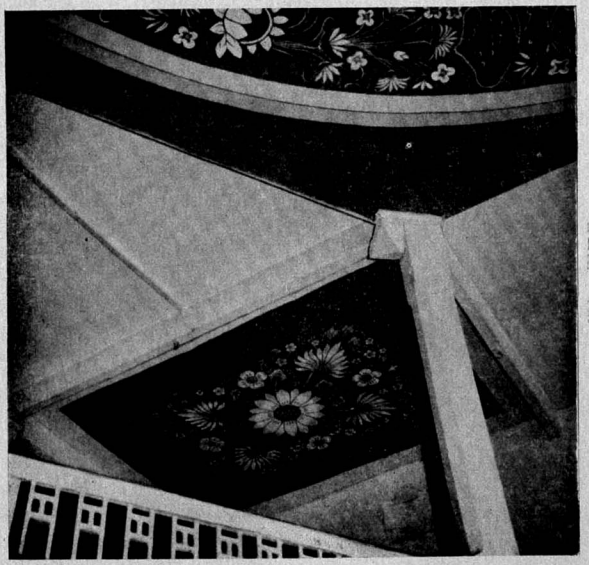

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের দেয়ালচিত্রের একাংশ

পানের আসর বসত সেখানে রাখা আছে বহু রকমের বুদ্ধমূর্তি—ধ্যানী বুদ্ধ, উপবিষ্ট বুদ্ধ, গান্ধার স্কুলের বুদ্ধ প্রভৃতি। এছাড়া আছে মোগল ও রাজপুত যুগের বহু চিত্র। ভারতের সুপ্রাচীন শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ডাল হাতে ছোটাছুটি কোরতে দেখা যায় এবং অপরটিতে দেখা যায় বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র নিজের উদ্ভাবিত প্রসিদ্ধ ক্রেসক্রোগ্রাফ যন্ত্র নিয়ে কর্মরত। বৈঠকখানায় জগদীশচন্দ্রের শিল্পানুরাগের নিদর্শন স্বরূপ আরও আছে

প্রতি বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের কি পরিমান অনুরাগ ছিল এসব কি তারই নিঃসংশয় প্রমাণ নয়?

নিজস্ব বাসভবনের সংলগ্ন জমিতে নিজের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণ কোরেছিলেন ১৯১৭ সালে, সেখানে গেলেও আমরা এই একই দৃশ্য দেখতে পাই। ইচ্ছা কোরলে তিনি এটিকে আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মাণ করাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করান নি—যেমন তিনি এর নাম গবেষণাগারও দেননি। তিনি এ গৃহের নামকরণ কোরেছেন 'বিজ্ঞান মন্দির' এবং মন্দির নির্মাণে মানুষ যেমন সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পরুচির পরিচয় দেয়, তিনিও এ গৃহ নির্মাণে সেইরূপ সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পরুচির পরিচয় দিয়েছেন। নিছক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যে গৃহ নির্মিত হোয়েছিল তার মধ্যে কোন কারুকার্য না থাকলে কারও কিছু বলার থাকত না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের শিল্পী-মন শুধু প্রয়োজনের নিয়ম মেনে চলত না। এই বিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যেও তিনি তাঁর শিল্পানুরাগের পরিচয় রেখে যেতে চেয়েছেন। যাঁরা এখানে কাজ করবেন, তাঁরা যাতে সুন্দর পরিবেশে শান্তচিত্তে কাজে আত্মনিয়োগ কোরতে পারেন তাই বোধ হয় ছিল তাঁর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়। ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রতি জগদীশচন্দ্রের যে অনুরাগ ছিল তার জীবন্ত নিদর্শন হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পরিকল্পিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দির। তিনি স্থির কোরেছিলেন যে ভারতীয় স্থাপত্য রীতি অনুসারেই বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গৃহটি নির্মাণ কোরবেন। এই কাজে তিনি সহায়ক হিসাবে গ্রহণ কোরেছিলেন নিজের মামাতো ভাই শ্রীঅবনীনাথ মিত্রকে। শ্রীমিত্র তার কিছুকাল পুর্বে জাপান থেকে ফিরে এসেছিলেন শিল্প-কলা ও বিস্কুট নির্মাণ বিদ্যা শিখে। শ্রীমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে জগদীশচন্দ্র ১৯১৭ সালের সুরুতে সারনাথে যান। উদ্দেশ্য সেখানকার বৌদ্ধ স্থাপত্যকলা পর্যবেক্ষণ ও তদানুসারে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গৃহনির্মাণ। সেখানে কিছু-দিন থেকে তিনি বৌদ্ধযুগের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি অনুধাবন কোরে কতকগুলি নক্সা সংগ্রহ করেন। তারপর শ্রীমিত্রকে পাঠানো হয় চুনারে প্রস্তাবিত গৃহনির্মাণের জন্যে পাথর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। প্রয়োজনমত পাথর সংগ্রহ করে তিনি কাশীতে যান এবং এবং সেখান থেকে গৃহনির্মাণের জন্যে কিছু দক্ষ কারিগর সংগ্রহ কোরে আনেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণের কার্যারম্ভ হয় এবং এই গৃহটির উদ্বোধন হয় ঐ সালেরই ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিনে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশের পথে দুদিকে দুটি কালো পাথরের ছোট স্তূপের মত বস্তু নজরে পড়ে। এগুলি সারনাথের কালো পাথরে তৈরি এবং এ দুটি আলোকসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয়। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ঠিক সামনে যে সামান্য উন্মুক্ত স্থান আছে সেখানে বাঁদিকের দেয়ালে দেখা যাবে ভগিনী নিবেদিতার একটি মূর্তি অঙ্কিত। ভগিনী নিবেদিতার প্রতি আচার্য জগদীশচন্দ্রের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। ভগিনী নিবেদিতার হাতে একটি দীপ—স্পষ্টতই এটি জ্ঞানের প্রতীক। নিচে পদ্ম পরিপূর্ণ একটি ছোট পুকুরের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার দেহভস্ম রক্ষিত আছে। এই চিত্রটি এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিল্পী দেবল। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারটি তৈরী করা হোয়েছে হ্যাভেলের বই-এর একটি নক্সার অনুকরণে। মূল দরজার উপর পিতলে উৎকীর্ণ হোয়েছে বনচাঁড়াল ও লজ্জাবতী লতার নক্সা। এই বনচাঁড়াল ও লজ্জাবতী লতা নিয়েই জগদীশচন্দ্রের প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত হোয়েছিল। এছাড়া আছে বজ্র ও পদ্ম। পদ্ম হলো পবিত্রতা ও কোমলতার প্রতীক আর বজ্র হলো বীর্যের প্রতীক। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' এই ছিল জগদীশচন্দ্রের জীবনাদর্শ। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিকল্পনায়ও তিনি তাঁর এই জীবনাদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছেন সকলের সম্মুখে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কারুকার্য পবিত্রতার প্রতীক পদ্ম একটা বড় স্থান দখল কোরে আছে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সম্মুখ-ভাগের শীর্ষদেশে যে হাওয়া ঘরটি নির্মিত হোয়েছে তার প্রেরণা জগদীশচন্দ্র পেয়েছিলেন কাশীর প্রসিদ্ধ মানমন্দির থেকে। ছাদের উপরে আছে পিতলের তৈরি বজ্র। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ পথের মাঝামাঝি জায়গায় আছে একটি কাঠের কাশ্মীরী গেট। এটি জগদীশচন্দ্র উপহার পেয়েছিলেন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে। ডান-দিকের একটি দরজা জগদীশচন্দ্রের নির্দেশে দার্জিলিংএর বৌদ্ধ গুম্পার অনুকরণে নির্মাণ করা হোয়েছিল। বিজ্ঞান-মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের রূপসজ্জা ও পাথরে খোদাই-র কাজ করা হোয়েছে সারনাথে প্রাপ্ত নক্সা অনুসারে। কোথাও কারুকার্যের আতিশয্য নেই অথচ কারুকার্য যেটুকু আছে তা সুন্দর ও অর্থবহ।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ কোরলে প্রথমেই পাওয়া যায় একটি ছোট হলঘর। তার উত্তর প্রান্তে রাখা আছে ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তৈরি জগদীশচন্দ্রের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি। মূর্তিটি দেবীপ্রসাদ তৈরি কোরেছিলেন ১৯৩২ সালে। এই ছোট হল ঘর দিয়েই প্রবেশ কোরতে হয় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রসিদ্ধ বক্তৃতা কক্ষে। বক্তৃতা কক্ষটির বৈশিষ্ট্য হলো এর রূপসজ্জা। এখানেও জগদীশচন্দ্রের সেই স্বাভাবিক শিল্পানুরাগের পরিচয় স্পষ্ট। কাঠের বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখ ভাগে আছে সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেবের চিত্র। অজন্তা গুহাচিত্রের অনুকরণে এই চিত্রটি কোরেছিলেন আচার্য নন্দলাল। সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেবের দ্বাদশ শিখার প্রতীক হিসাবে আছে দ্বাদশ মূর্তি—আলো এবং অন্ধকারের প্রতীক হিসাবে আছে দুটি মূর্তি। মঞ্চের পিছনে দেওয়ালের উপরে আছে আচার্য নন্দলালের পুরুষ ও নারীর আর একটি বিরাট চিত্র। পুরুষের হাতে নগ্ন তরবারি—সে ছুটে চলেছে সত্যের সন্ধানে আর পিছনে চলেছে নারী বাঁশি হাতে—কল্পনা ও প্রেরণা জোগাতে। তাদের পিছনে পড়ে আছে পদচিহ্ন—যে পদ চিহ্ন অনুসরণ করবে পরবর্তী যুগের লোকেরা। মঞ্চের উপরে যে ছাত সেখানেও অজন্তা গুহাচিত্রের ধরনে রূপসজ্জা করা হোয়েছে। আচার্য পরিকল্পিত বিজ্ঞান-মন্দিরের রূপসজ্জার যে পরিচয় দেওয়া হলো এর পরও কি একথা বলার অপেক্ষা রাখে যে তাঁর চরিত্রে শিল্পানুরাগ ছিল একান্ত সহজাত এবং স্বাভাবিক?

। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের চিত্রনক্সার ও শিল্পবস্তু সজ্জিত আভ্যন্তরীণ একাংশ।

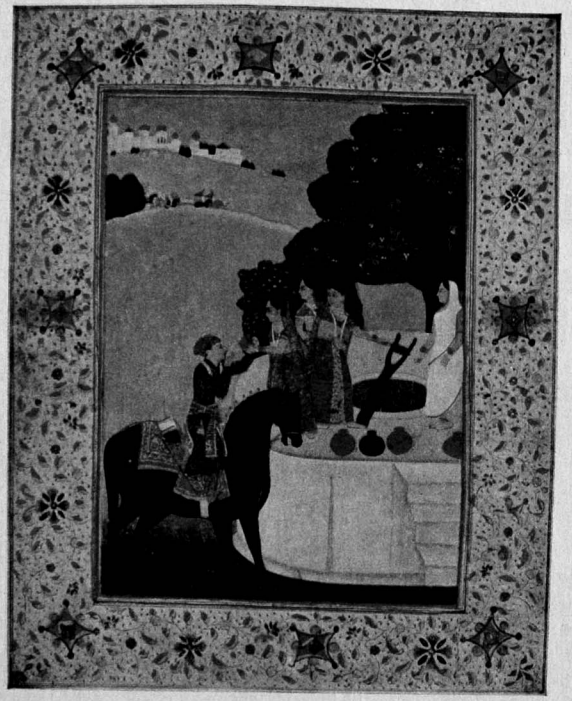

অশ্বপৃষ্ঠে বারি পানরত তৃষ্ণার্ত রাজকুমার। সিরকা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। রাজপুত-মুঘল শৈলী।

একালের শিল্প-সংগ্রাহক এ. এন. সেন

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গত এ. এন. সেন বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় শিল্প-সংগ্রাহকদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরে ছিলেন। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর সংগ্রহ থেকে কয়েকটি প্রাচীন চিত্র প্রকাশ করে আনন্দলাভ করা গেল। পুনরায় সুযোগ পেলেই সুন্দরম্‌এর অন্য কোনো সংখ্যায় তাঁর চিত্র সংগ্রহের আরো কিছু প্রতিলিপি দেবার ইচ্ছা রইল।

সখ মাত্রেরই চরিত্র আছে। কুল আছে, জাত আছে। হরেক রকমের সখের মধ্যে কোন সখ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ তা তর্ক সাপেক্ষ; কিন্তু সকল সখের মধ্যে শিল্প-সংগ্রহের —তা প্রাচীনই হোক অথবা অতি আধুনিকই হোক—এই আর্ট ও এ্যান্টিক কালেক্‌সনের সখ জাতে নৈকষ্য কুলীন সে সম্বন্ধে কিন্তু সন্দেহের অবকাশ নাই। এ সখ সকলের হয় না, জাত সখ বোলে একমাত্র অভিজাতদের মনেই এর জন্ম-বৃদ্ধি। একে নিছক সখ বোললে উনোক্তি হবে, কারণ প্রকৃতিতে এটা নেশারই পর্যায়ভুক্ত।

এবং ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় আদিতে আমাদের দেশে—এই বাংলা দেশের—অভিজাতদের মধ্যেই চিত্র ও বিচিত্রের—তথা আর্ট ও কিউরিও সংগ্রহের নেশা জন্ম নিয়েছিল। বাংলাদেশের পুরোণো জমিদার, রাজা-রাজড়াই এই শিল্পসম্ভার সংগ্রহে সদাই ব্যস্ত থাকতেন। এতে তাঁদের নিজেদের বাড়ীগুলি বোলতে গেলে এক একটি ছোটখাটো সংগ্রহশালা হিসেবে গোড়ে উঠতে সক্ষম হোয়েছিল। এই সংগ্রহশালাতেই তদানীন্তন বাংলাদেশে শিক্ষিত সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের আনন্দ, তৃপ্তি, অহংকারের বিজয় পতাকা—নীলরক্তের নির্ভুল পরিচয় চিহ্নসহ, রেষারেশীর রক্তিম আকাশে সদাই থাকত উড়িয়মান।

শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে অগ্রগণ্য বাংলাদেশের ঠাকুর পরিবারের এইরূপ কলাবস্তু ও শিল্পসংগ্রহের নেশা বহুদিন হোতে প্রসিদ্ধীলাভ কোরেছে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই শিল্প-সংগ্রহের নেশা বা সৌখিনতা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হোয়ে এসেছিল। শিল্প-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঠাকুর পরিবার যে কি অকাতরে অর্থব্যয় কোরে গেছেন—শুধু অর্থব্যয় নয়—কি পরম মমতায় প্রত্যেকটি জিনিস সংগ্রহ কোরে রক্ষা করার

প্রচেষ্টা কোরে গেছেন তা এই পরিবার সম্পর্কে যিনি সামান্যতম খোঁজ-খবর রাখেন—তিনিই অবগত আছেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মরণীয় সংগ্রহশালা শুধু ঐতিহাসিক নয়, শিল্পমূল্যে ও বাংলাদেশের গর্বের বস্তু ছিল কিন্তু সে সংগ্রহ অক্ষম বাংলাদেশ থেকে সাদরে ওভরাট কেবলমাত্র সরিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সমাদরে ও সযত্নে তা রক্ষনাবেক্ষণেও পরিকল্পনাশীল মানসের পরিচয় দিয়েছে।

ঠাকুর পরিবার ছাড়া বাংলাদেশের বর্ধমানের রাজ-পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ পরিবার বা মার্বেল প্যালেসের মল্লিক পরিবারের মতো আরও কয়েকটি পরিবারের নাম উল্লেখ করা যায়, আর্ট ও কিউরিও কালেকশানের ব্যাপারে যাঁরা সত্যিকারের খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে বর্ধমানের মহারাজগণের সংগৃহীত চিত্র ও শিল্পদ্রব্যাবলীর অধিকাংশ বর্ধমানে অবস্থিত রাজপ্রাসাদে থাকার দরুণ কোলকাতার জন-সাধারণ সেই শিল্পবৈভব সম্পর্কে খুব কম খবরাখবর রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক পরিবার বর্ধমানের রাজবংশের গর্ববযোগ্য সেই কালেকশান বর্তমান মহারাজাবিরাজ দেশ-বিভাগের পর সাধারণ্যে নিলামে বিক্রী কোরেছেন, আভিজাত্যের সনাতন গর্ব নিয়ে অনর্থক আঁকড়ে পড়ে থাকেন নি। তাঁর এই যুগোচিত মনোভাবের ফলে বাংলাদেশের বহু সাধারণ শিল্পরসিক-জন বর্ধমানের রাজপরিবারের দীর্ঘকাল সঞ্চিত শিল্প-সংগ্রহের বহু নিদর্শন সংগ্রহ কোরতে পেরেছেন।

বর্ধমানের রাজপরিবারের মতো পাইকপাড়ার সিংহ-পরিবার ও উত্তর কলিকাতার মার্বেল প্যালেসের মল্লিক পরিবারের আর্ট কালেকশানও অত্যন্ত মূল্যবান।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে এই তিন পরিবারের কালেকশানের প্রায় সব ক'টি নিদর্শনই পাশ্চাত্যের। প্রাচ্য বা ভারতীয় শিল্পনিদর্শন খুবই কম। প্রাচ্য বা ভারতীয় শিল্পনিদর্শনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথই বোলতে গেলে প্রথম পথ-প্রদর্শক।

রাজা-রাজড়া জমিদার ইত্যাদি সামন্ততন্ত্রের যুগ আজ শীতকালের সূর্যের মতো অস্তায়মান। তার অতীত স্বর্ণচ্ছটা স্মরণ কোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাভ নেই। নতুন যুগকে সাদরে বরণ করার আয়োজন কোরতে হবে আমাদের। কাজেই জমিদার রাজা-রাজড়ার অন্যতম আভিজাত্য চিহ্ন তাঁদের দীর্ঘকাল সঞ্চিত আর্ট কালেক-শানগুলি নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা যুগবিরোধী মনোভাবেরই পরিচায়ক। বরং আমাদের উচিত সেই কালেকশানগুলি তাঁদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে সংরক্ষিত করা। এবং এ কাজে একমাত্র সহায়তা কোরতে পারেন আমাদের জাতীয় সরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সরকার এ ব্যাপারে আশ্চর্যরকম উদাসীন। বিশেষ কোরে বিদেশীয় আর্ট কালেকশানের ব্যাপারে তাঁদের এই শিলাপ্রতিম উদাসীন্যের ফলেই বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য শিল্প সংগ্রহের নিদর্শনগুলি ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং এমন দিনও হয়তো একদিন আসবে যখন আমরা দ্বিগুণ বা তিনগুণ মূল্য দিয়ে সেই সব নিদর্শন পুনরায় কেনবার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ঘুরে বেড়াব। মুশকিল হোচ্ছে আমাদের দেশে এখনো আর্ট অ্যাপ্রি-সিয়েশনের কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড গড়ে ওঠেনি, আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েসনের স্থলে আর্টস্নন্যতাই এখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এর ফলে আমাদের দেশে আর্ট নিয়ে কথা হয় যত, কাজের কাজ হয় তার চাইতে শতগুণ কম। আমাদের জাতীয় সরকার যদি এই সমস্ত পুরোণ বিদেশীয় শিল্পের এবম্বিধ দুর্মূল্য কালেকশানগুলি জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেন, তা হলেই সত্যিকারের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করা হবে! অতীতে আমরা অনেক ভুল কোরেছি, তার জন্য অনেক মূল্যও আমাদের দিতে হোয়েছে, আর্ট কালেকশনের ব্যাপারে যেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়, সরকারের কাছে এই আমাদের নিবেদন।

থাক, যে কথা বলছিলাম: বিভিন্ন বাঙালী পরি-বারের আর্ট কালেকশানের কথা। প্রাচ্য ও ভারতীয় আর্ট কালেকশানে ঠাকুর পরিবারের দান সর্বাগ্রগণ্য এ কথা আগেই বোলেছি। এ প্রসঙ্গে উলেখ্য, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ শুধু ভারতীয় আর্ট কালেক-শানই করেননি, উপযুক্ত পটভূমিকায় তাদের সংরক্ষণের জন্য উপযোগী আসবাবপত্র নক্শা ইত্যাদির প্রথম প্রচলন তাঁরাই কোরেছিলেন।

ধূমপানরতা। কাংড়া শৈলী। পাহাড়ী কলম।
নিরকা: অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

যাই হোক বাংলাদেশে অভিজাত শিল্প-সংগ্রাহক ও তাঁদের বহু ব্যয়সাধ্য, কষ্টসাধ্য শিল্প-সংগ্রহের নানারূপ হতাশজনক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ঘটনায় আবার আশারও সঞ্চার হয়। শিল্প-সংগ্রহের সীমিত সৌখিনতা এখন অনেক মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক জীবনও স্পর্শ কোরেছে। শুধু অর্থবানই নন এখন অনেক মধ্যবিত্ত ব্যক্তিও বিচিত্রের তথা কিউরিও সংগ্রহের সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল। এঁদের অনেককেই হয়তো আমরা চিনি না, জানি না, কিন্তু যে মুষ্টিমেয় কয়জনকে আমরা চিনি অথবা জানি তাঁদের অগ্রগণ্যদের মধ্যে যিনি অন্যতম তাঁরই কথা আজ আমরা এখানে উল্লেখ কোরব।

যাঁর কথা বোলছি, সামাজিক পরিভাষায় তিনি উচ্চ-মধ্যবিত্তের পর্যায়ভুক্ত। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। শিক্ষায়-দীক্ষায় সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন শহর কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক। জাস্টিস এ. এন. সেন-এর আর্ট কালেকশানের কথা শিল্পানুরাগী অতি সামান্যতম লোক জানলেও শিক্ষিত শিল্পপ্রিয় বাঙালীদের আজ অবশ্য জানা উচিৎ।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন বিচারপতি সেন। শিল্পদ্রব্যের প্রতি অমন নিখাদ ভালোবাসা, অমন খাঁটি দরদ খুব কমই দেখা যায়। একটি দিনের কথা মনে পড়ে। এ, এন, সেন খবর পেলেন বলরাম দে ষ্ট্রীটে জনৈক শিল্পদ্রব্য-বিক্রেতার কাছে অনেক ভালো পুরাণো জিনিস রয়েছে। শুনেই হানা দিলেন ঐ বিক্রেতার বাড়িতে। বলরাম দে ষ্ট্রীটের একটি প্রায়ান্ধকার স্যাঁতসেঁতে সংকীর্ণ পরিসর ঘরে হাজির হোলেন। আবিষ্কারের আনন্দে একটি একটি কোরে সমস্ত জিনিস দেখলেন, অনেকক্ষণ ধরে মমতাপূর্ণভাবে নিরীক্ষণ কোরলেন, তারপর জিনিসগুলো সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর চোখে-মুখে তখন আনন্দের দ্যুতিময় মূর্চ্ছনা।

শিল্পের জন্য উৎসর্গপ্রাণ ছিলেন এ, এন, সেন। শিল্পদ্রব্য-সংগ্রহের জন্য যে কোনো রকম কষ্ট সহ্য কোরতেন তিনি। এজন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভারত-বর্ষের দূর দুরান্ত অঞ্চলে যেতেও তিনি পশ্চাৎপদ হোতেন না ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি ধরনের জিনিস পাওয়া সম্ভব, কোথায় কোন বিক্রেতার

মুঘল দরবারের
কোনো অজ্ঞাত ওমরাহ।
মুঘল শৈলী। সিরকা ঃ
অষ্টাদশ শতাব্দীর
মধ্যভাগ।

কাছে গেলে পুরানো জিনিস পাওয়া সম্ভব, এ সমস্ত-ই ছিল তাঁর নখদর্পণে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি আর্ট ডীলারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি তাঁদের সব চাইতে বড় খদ্দের না হোলেও সব চাইতে নিষ্ঠাবান এবং সমঝ্‌দার খদ্দের যে ছিলেন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তাঁকে অসুস্থ শরীর নিয়ে শিল্পদ্রব্য সংগ্রহের দুর্মর নেশায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতো। অসুস্থ—চলতে-ফিরতে নিদারুণ কষ্ট—পারছেন না, তবু কোথাও কোনো পুরানো ছবি বা মূর্তি আছে শুনলে তিনি উৎসাহে ছুটে গেছেন সেখানে, আনন্দে বিস্ময়ে আগ্রহে তুলে নিয়েছেন সেই ছবি বা মূর্তি। বলা বাহুল্য, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর এই দুর্মর শিল্প-প্রীতি অনির্বাণ ছিল।

শিল্পের প্রতি এই নিবিড় ভালোবাসা, এই গভীর অনুরাগই ছিল বিচারপতি এ. এন. সেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং বলা যায় সেইটিই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধানতম কুললক্ষণ। সমাজের যে স্তরের বাসিন্দা ছিলেন, সে স্তরের বাসিন্দাদের অনেকেরই মধ্যে আজ শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এ. এন. সেন সেই শিল্পানুরাগী বাসিন্দাদের মধ্যে প্রবীন-প্রতিম ব্যক্তিত্ব। জীবনের শেষ ভাগে তিনি যে শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ কোরে গেছেন, তা বাঙালীর গর্বের বস্তু। বিশেষ কোরে পুরানো ছবির অত ভালো সংগ্রহ খুব কম চোখে পড়ে। তাঁর ব্রঞ্জের, আইভরির ও অলঙ্কারের সংগ্রহও কিছু কম নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিল্প-সংগ্রাহক এ. এন. সেনের এই সংগ্রহ দিয়ে ছোট হলেও একটি চমৎকার সংগ্রহশালার সূত্রপাত হোতে পারতো। ইউরোপের ক্ষুদ্রাদপি শহরেও একাধিক সংগ্রহ-শালা দেখা যায়; যেখানে ভারতবর্ষের একটি অগ্রগণ্য ও পৃথিবীর অন্যতম উল্লেখ্য শহর কোলকাতায় 'ভারতীয় যাদুঘর' বা 'আশুতোষ সংগ্রহ-শালা' ছাড়া কোনো ভালো সংগ্রহ-শালা নেই। অথচ এখানে এমন অনেক ভালো ব্যক্তিগত সংগ্রহ আছে, যেগুলির সমবায়ে একাধিক আকর্ষণীয় সংগ্রহ-শালা গড়ে তোলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-বিষয়ে অগ্রণী হোতে পারেন, কিন্তু তাঁরা আর কোনো ব্যাপারেই অগ্রণী হোতে চান না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বা সম্ভাব্য বর্ধমান ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ্রহ-শালা অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো পর্যন্ত তার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেলো না। আসল কথা, শিল্পরুচি জিনিসটা আমাদের শাসনবিভাগীয় বড়-কর্তাদের গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি; শিক্ষায়তনের কীর্তিমান ধ্বজা-ধারীরাও শিল্পরুচি থেকে শত হস্ত দূরের নির্জনতায় বিচরণ-বিলাসী।

মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম নামে কোলকাতায় একটি কমার্শিয়াল মিউজিয়াম আছে। সে মিউজিয়াম কি অর্থে কমার্শিয়াল এবং কি অর্থে মিউজিয়াম, তা এক কর্পোরেশনের শিল্পরসিক কর্তারাই জানেন এবং একমাত্র তাঁরাই হয়তো তার রসিক দর্শক। সে মিউজিয়ামের অবস্থান ব্যবস্থাপনা সত্যই চোখে পড়া ও মনে রাখার মতো যা কোলকাতা কর্পোরেশনেরই চরিত্র ও খ্যাতির চমৎকার প্রতীক বিশেষ! আমাদের কর্পোরেশনের বা সরকারের বড় কর্তারা যদি ক্ষণিকের জন্যও তাঁদের চোখ খোলেন, তবে তাঁরা দেখবেন এই ভারতবর্ষেই—আমেদাবাদে একটি সুন্দর মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে এবং একজন বাঙালী শ্রীযুত পৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগীকেই তার উন্নতির জন্য নিয়ে গিয়ে ছিলেন তাঁরা ও তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত কোরেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ পৃথ্বীশবাবুর মতো গুণী ব্যক্তির কর্মক্ষমতার ফললাভ কোরতে পারে না কেন, এইটেই জিজ্ঞাস্য!

এখানে বলা যেতে পারে—বাংলাদেশে শ্রীঅজিত মুখার্জির মতো এখনো দু'একজন গুণী ব্যক্তি রয়েছেন। 'আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রী'র সংগ্রহ-শালা শিল্পকর্মী অজিতবাবুর অন্যতম কৃতিত্ব। বিন্যাস-সজ্জায় উক্ত সংগ্রহশালাটি বিশেষ উল্লেখ্য। শুনলাম অজিতবাবু ও বাংলাদেশ ছেড়ে 'দিল্লী চলো'র মিছিলে যোগ দিতে চলেছেন। শ্রীমুখার্জি থাকলে শ্রী সেনের সংগ্রহের হয়তো একটা সুব্যবস্থা হোতো।

বরাহ শিকার।
সিরকাঃ
অষ্টাদশ শতাব্দীর
প্রথম ভাগ।

'ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট' প্রবন্ধ সম্পর্কে পত্র ও উত্তর

সুন্দরম্ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'কবিস্থপতি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট' প্রবন্ধটি শারদীয় সুন্দরমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানবেন। কিন্তু স্থপতিদের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে, মনে হয় প্রবন্ধটি প্রকাশ করার আগে কিঞ্চিৎ বিচার বিবেচনার প্রয়োজন ছিলো।

আধুনিক স্থাপত্যকলা প্রসঙ্গে লেখকের কোন ধারণা না থাকায় কতকগুলো মারাত্মক প্রমাদের সৃষ্টি হয়েছে, অনেকটা হাস্যকর ; কোনটি তথ্যের কোনটি তত্ত্বের ভুল। আরেকটা কথা লেখককে জানাবার আছে যে দু'একটি ইংরেজি প্রবন্ধ অবলম্বন করে স্থাপত্যকলা সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা বাতুলতা মাত্র কেননা স্থাপত্য শুধু শিল্প নয়—, এ শিল্প ও বিজ্ঞানের সমষ্টি এবং স্থাপত্য-বিচার সোজা কাজ নয়।

ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট জন্মগ্রহণ করেন বোধ হয় ১৮৬৯ সালে, ১৮৬৮ সালে নয়। 'বোধ হয়' বলছি এই কারণে যে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে তবে ১৮৬৯ সালের পক্ষেই জীবনীকারদের সংখ্যা বেশী। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি স্থাপত্যকলা সম্পর্কে কোন দিনও জ্ঞান লাভ করেন নি, তিনি করেছিলেন সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে কিন্তু পাঠগ্রহণ শেষ না করেই চলে যান। আর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ মার্কিন স্থপতি সুলিভানের কাছ থেকে কোন দিনও তিনি আমন্ত্রণ পাননি। একদিন নিজেই তিনি বর্ডেন ব্লক বাড়ির ওপরতলায় ভয়ে ভয়ে এসে পৌঁছান নিজের কয়েকটা ড্রইং হাতে করে। প্রথমে রাজী হননি সুলিভান কিন্তু পরে মাসিক পঁচিশ ডলার মাইনেতে কাজে নিযুক্ত করেন।১ সুতরাং লেখকের আমন্ত্রণ কথাটি অবাস্তব।

লেখক মার্কিন স্থাপত্যের যুগবিভাগ করেছেন। কোন পুস্তকের সাহায্য নিয়েছেন তা সহজেই অনুমেয় কিন্তু স্থাপত্যকলা সম্পর্কে পড়াশুনা থাকলে গ্রীক রিভাইভ্যাল বা ক্লাসিক যুগের পরিবর্তে বলতেন রেনেশাঁস যুগ। লেখক লিখেছেন, '১৮৬১র গৃহযুদ্ধে বৈচিত্র্যহীন এই মার্কিন স্থাপত্যকলা মুক্তিলাভ করলো এবং নব জীবনের প্রাণবন্ত তারুণ্যে মুখর হয়ে উঠল।' একথা ঠিক নয়। গৃহযুদ্ধ মার্কিন স্থাপত্য কলার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। সেই সময় লোহার আবিষ্কার বিস্ময়কর পরিবর্তন আনে এবং লিফ্‌ট আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে উঁচু বাড়ি তৈরীর প্রেরণা জাগে। চিকাগোর স্থাপত্যে যে উন্নতি ঘটে তার কারণ ১৮৭১ সালে চিকাগোর অগ্নিকাণ্ড।২ লুই সুলিভানের আমলের কয়েকজন স্থপতির নাম লেখক উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে আছেন জন ওয়েলবর্ণ রুট। কিন্তু রুট সর্বদাই বার্নহামের সঙ্গে কাজ করতেন। যে জন্য রুটের খ্যাতি সেই মনটুয়াক বিল্ডিংএর (১৮৮২) স্থপতিও এঁরা দুজন।৩ তাছাড়া এ প্রসঙ্গে আরেকজন প্রতিভাবান্ স্থপতির নাম লেখক উল্লেখ করেননি। তিনি হচ্ছেন জেনী, যিনি বাড়ির কাঠামোতে সর্বপ্রথম লোহা ব্যবহার করেন।

লেখকের প্রবন্ধ পড়লেই বোঝা যায় যে লেখক এর আগে 'অরগানিক আর্কিটেকচার' কথাটার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এবং পরিচিত হলেও বুঝতে পারেন নি। লেখকের মতে মার্কিন পরিবার আর স্ব-নির্ভর না হয়ে 'অন্যোন্যনির্ভর' হলো, এটা অরগানিক আর্কিটেকচারের অন্যতম কারণ। এটা ঠিক নয়, বরং এর উল্টোটাই সত্যি, স্থাপত্যকর্মের প্রত্যেকটির অংশের পারস্পরিক নির্ভরতা মানি কিন্তু ওটা মানতে পারা যায় না। এ সম্পর্কে লেখককে অভিহিত হতে বলি।৪

লেখক লিখেছেন "অরগানিক আর্কিটেকচার" এই কথাটি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের নিজস্ব আবিষ্কার বা বলা যেতে পারে স্বনির্মিত। একথা আদৌ সত্য নয়। খৃষ্ট জন্মের পাঁচশো বছর আগে চীনের মহাপুরুষ লাওৎজে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে কথা বলেন। লেখক ৭৫ পৃষ্ঠায় রাইটের উক্তি বলে যা লিখেছেন অর্থাৎ জায়গা বা স্পেস সম্বন্ধে সেটাও লাওৎজের কথা। এ সম্পর্কে রাইটের আত্মজীবনীতে স্বীকৃতি আছে। আর সত্যিকারের 'অরগানিক আর্কিটেকচার' সম্পর্কে সর্বপ্রথম বলেন দার্শনিক স্পেংলার। তিনি বলেন, মন্দির-স্থাপত্য-কলা কিন্তু বাসগৃহ নয়, কেননা এ কতকটা উদ্ভিদের মত মাটি থেকে ওঠে।৫

আমাদের পরিভাষায় 'অরগানিক আর্কিটেকচারের' বাংলা 'জৈবিক স্থাপত্য কলা'। একটা গাছকে যেমন চারধার থেকে ভালো দেখায় তেমনি দেখাবে বাড়িকে। গাছের যেমন ডাল পালা তেমনি বাড়ির কাঠামো। জৈবিক স্থাপত্য কলার এটাই মূল কথা এবং এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ জনসন কোম্পানির বাড়ি (ওটা বেসিন নয় রেসিন হবে)। কবিস্থপতি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের পরিচয় দিতে হলে ঐ বাড়ির আলোক-চিত্র দেওয়া একান্ত উচিত ছিল। লেখক তার বদলে ডেভিড রাইটের বাড়ির কথা বলেছেন কিন্তু বোধ হয় তিনি জানেন না যে বাড়িটার অনেকাংশ ভেঙ্গে গিয়েছে এবং এটা ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের কোন উঁচুদরের শিল্পকর্ম্ম নয়। ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট যে সব বাড়ি তৈরী করেছেন তার মধ্যে লেখক 'গুগেনহাইম' মিউজিয়ামের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু লেখক বোধ হয় জানেন না যে সে বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর এখনো স্থাপিত হয় নি। অজ্ঞতাটা হাস্যকর। ট্যালিয়েসেন (ট্যালিজান নয়) শুধু গ্রীষ্ম ও শীতাবাস নয়, ওখানে রাইটের স্কুল ও অফিস আছে। আর 'কুনলি' হাউসের পরিবর্তে জ্যাকব হাউসের প্রশংসা করলেই যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হতো।

এবার ৭৭ পৃষ্ঠায় আসা যাক। লেখক লিখেছেন যে তাঁর বাড়িতে জানলাগুলো সাধারণতঃ হরাইজন্টাল ভাবে স্থাপিত হয়। এটা সত্যের অপলাপ। ওই কথার অর্থ অন্য। লেখক প্রবন্ধের সঙ্গে যে সব চিত্র দিয়েছেন তার কয়টা বাড়িতে হরাইজন্টালভাবে জানলা আছে? জনসন কোম্পানীর বাড়ি কাঁচে মোড়া, সে কাঁচ হরাইজন্টাল গ্লাস টিউব, মনে হয় এ থেকেই লেখক ভেবেছেন যে সব বাড়িই ওরকম। লেখক বলেছেন, রাইটের বাড়িতে

১ Autobiography of Frank Lloyd Wright.

২ Space, Time and Architecture—Giedion

৩ The Rise of Skyscrapper in U.S.A., Architectural Press

৪ The Culture of Cities—Lewis Mumford

৫ The Decline of the West—Spengler.

আলো হাওয়ার কোন অভাব নেই, একথাও সত্য। নয় তাঁর প্রথম দিকের বাড়ি কিছুটা অন্ধকার কতকটা গুহার মত, কেননা...'for Wright the house is a shelter, a covert into which the human animal can retire as into a cave protected from rain and wind and light ? ৬ আর একটা কথা, ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট শুধু বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার ধরনের কামরা নির্মাণ করেন নি, তিনি ষড়ভুজ আকার বিশিষ্ট কামরা ও স্থান সৃষ্টি করেছেন, তার সংখ্যাই বেশী এবং সেটাই অরগানিক আর্কিটেকচারের উদাহরণ। ৭ তাঁর মতে ষড়ভুজ আকারেরই আছে more flexibility and fertility where human movement is concerned than the square। ৮

লেখক লিখেছেন যে তাঁর এই প্রকৃতিমুখিনতা বা প্রকৃতি-মগ্নতা, বলা বাহুল্য আকাশস্পর্শী স্কাইস্ক্রেপারের আমেরিকায় একটি ব্যতিক্রম-প্রোজ্জ্বল ঘটনা বিশেষ। আকাশস্পর্শী আর স্কাইস্ক্রেপার একই কথা। লেখক কি জানেন না যে ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট বর্তমানে চিকাগোর যে বাড়ির নকসায় ব্যস্ত আছেন তা জগতের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি হবে। প্রায় এক মাইল উঁচু? এবং সেটা হবে অরগানিক আর্কিটেকচারের এক যোগ্যতার উদাহরণ? এবং জনসন কোম্পানীর বাড়িও চোদ্দতলা।

কিন্তু সবচেয়ে হতাশ হয়েছি লেখকের একটা অদ্ভুত কথায়। সেটা হচ্ছে ল্য কুরবশিয়ে প্রসঙ্গে। লেখক লিখেছেন 'লে কোর্বুসিয়ের প্রকৃতিবিমুখ; প্রকৃতিকে পরিহাস করে চলেন। এটা স্থপতি ও স্থাপত্যের প্রতি অপমানকর কথা এবং এই কথাতেই লেখকের সব অজ্ঞতা পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছে। মাটির ওপর কয়েকটি স্তম্ভ স্থাপন করে তাদের ওপর বাড়ি তৈরীর অর্থ যাতে একতলাটা খোলা থাকে পেছনের বাড়িগুলো হাওয়া পায় এবং মাটির ওপর বাগান এবং ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পার্ক করা যায়। সবুজের সমারোহের জন্যই একতলাটা ফাঁকা। কুরবশিয়ে প্রথম ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন 'open spaces are the lungs of the city.' কুরবশিয়ের মতে কোন জমিতে (site-এর বাংলা জমিন নয় জমি, শিল্পসমালোচকের জানা উচিৎ জমিন' শব্দের অর্থ কি?) উঁচু বাড়ি তৈরী করতে হলে শতকরা ৫ ভাগে নির্মাণকার্য হবে, বাকি ৯৫ ভাগে গাছপালা, সবুজ ভূখণ্ড ইত্যাদি থাকিবে। ৯ ল্যকুরবশিয়ে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ Landscape Architect—ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের সঙ্গে কুরবশিয়ের তফাৎ অন্য জায়গায়। ১০

প্রবন্ধলেখক যদি আরো পড়াশোনা করতেন তাহলে দেখতেন যে ফ্রাঙ্ক লয়েডের চিন্তাধারা নগর পরিকল্পনাকে কতখানি প্রভাবিত করেছে এবং তাঁর 'ব্রডএকর' নগর পরিকল্পনা অর্গানিক আর্কিটেকচারের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ (লেখক ভুলেও তার নাম উল্লেখ করেন নি) এবং গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকলা। ১১ কুরবশিয়ের নগর পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে, কুরবশিয়ে গ্রামের আবহাওয়াকে শহরে আনতে চেয়েছেন আর রাইট গ্রামের ভেতর শহরের আবহাওয়া প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। ১২ দুজনেই প্রকৃতিকে সমান ভালবাসেন।

রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য সব সঙ্গীত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকায় তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচলন করলেন এবং খাঁটি সঙ্গীতের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই—একথা বললে সবাই বলবে পাগলের প্রলাপ। তেমনি প্রলাপোক্তি, কুরবশিয়ে প্রকৃতিবিমুখ, তাই মাটি থেকে ওপরে, স্তম্ভের ওপরে তৈরী করছেন।

পেঙ্গুইন সিরিজের J. M. Richards-এর বইটা সাধারণ লোকের জন্য, ওটা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নয়। ওই বইএর সমালোচনা প্রসঙ্গে Fortnightly Review বলেছিলেন, 'A cheaply acquired means for any one to obtain the basis of understanding and enthusiasm to enable him to play his part as a layman in getting the buildings our Post-war civilisation will need, even if it does not deserve them'.

---

৬ Space, Time and Architecture—Giedion
৭ Taliesen Drawings—Frank Lloyd Wright.
৮ An American Architecture—Frank Lloyd Wright

৯ The City of To-morrow—Le Corbusier
Towards a new Architecture—Le Corbusier.
১০ 'আধুনিক স্থাপত্যকলার বিচার'—সন্তোষ ঘোষ। শারদীয় সাহিত্যপত্র ১৩৬৪।
১১ When Democracy Builds—Frank Lloyd Wright
১২ 'হে সাগর সাগরের ঢেউ'—ফ্রাঙ্ক লয়েডের জীবনকথা, সন্তোষ ঘোষ। সাহিত্যিকা, বি, ই, কলেজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিপত্র ১৩৬৪।

আর লেখক যে উদ্ধৃতি করেছেন, তার অন্তর্নিহিত অর্থও অন্য, সেকথা আগেই বলেছি।

ইদানীংকালে বাংলা সাহিত্যে দেখা গিয়েছে যাঁরা সাংবাদিক তাঁরা হাইড্রোজেন বোমার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন এবং যাঁরা শিল্পী বা শিল্প-সমালোচক তাঁরা স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তি। লেখক বোধ হয় জানেন না যে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুরে স্থাপত্যকলা সম্পর্কে পাঁচ বছর পড়াশোনা হয়। সেখানে দেশ বিদেশের খ্যাতনামা স্থপতি ও অধ্যাপকেরা আসেন। সেখানে কারিগরী দিক ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা, স্থাপত্য শিল্প, আধুনিক স্থাপত্য আন্দোলন, আধুনিক শিল্প আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে ও পাঠদান করা হয়। এখানের স্নাতক তরুণ স্থপতিরা ভারতের স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের প্রয়াসী।

লেখক কিছু ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তার প্রমাণ ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দে, সেই সঙ্গে লেখক আগে পরিচিত ছিলেন না। যেমন Sullivan সালিভান নয়, ওটা সুলিভান, Illinois ইলিয়নস নয়, ইলিনয়স, Kauffman কাউফম্যান নয়, ওটা ক্যফম্যান, Le Corbusier লে কোর্বুসিয়ের নয় ওটা ল্য কুরবশিয়ে, বড় জোর বলা যেতে পারে লে করবুজিয়ে। কবিস্থপতি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের পরিচয় দিতে হলে যে সব কথা বলা উচিত ছিলো চিন্তার দৈন্য হেতু লেখক সেই সব কথা কিছু বলেন নি।

পরিশেষে একটা কথা বলব। লেখক স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে আলোচনার যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা উপযোগী হয় নি। কতকগুলি শব্দ অত্যন্ত শ্রুতিকটু, যেমন অযথেষ্ট, বাস্তুস্থাপত্য, কাঙ্খনীয় গাঠনিক সৌন্দর্য, কিছু-কিঞ্চিৎ, ব্যতিক্রম-প্রোজ্জ্বল, প্রদক্ষ ইত্যাদি।

'সুন্দরম্' বাংলা ভাষার একমাত্র আর্ট জার্নাল, এবিষয়ে আমাদের গর্ব থাকার কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কল্যাণবাবুর ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় 'সুন্দরমের' মর্যাদার হানি হয়েছে, সেই সঙ্গে এখানকার স্থপতিদের কাছেও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

ইতি
সন্তোষ ঘোষ

সম্পাদক সুন্দরম্ সমীপেষু
শ্রীসন্তোষ ঘোষ নামক জনৈক বিশেষজ্ঞের প্রতিবাদ-পত্র পাঠানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পত্র-লেখককেও এ সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট—Sheldon Cheney-র ভাষায় যিনি 'the most important of radical architects in the world to-day'—আধুনিক স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে স্তম্ভপ্রতিম ব্যক্তিত্ব বলেই বাঙালী শিল্পোৎসাহীদের কাছে তাঁর জীবন ও কর্মকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার বিনীত চেষ্টা করেছিলাম। এবং আমার প্রবন্ধ-পাঠকেরাও বোধ করি লক্ষ্য করেছেন, রাইটের স্থাপত্যকীর্তিসমূহের কারিগরি দিক নয়, শিল্পগত দিক নিয়েই আমি উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু এই সহজ সত্যটুকু দুর্ভাগ্যবশত ধরতে পারেন নি বলে সন্তোষবাবু গোড়া থেকেই অভিভূত—বলা যায়, আচ্ছন্ন বা বিরূপ—মন নিয়ে আমার লেখা পড়েছেন ও সমালোচনা করেছেন। ফলত তাঁর সমালোচনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অকারণ ক্ষোভ-প্রসূত নিন্দা-ভর্ৎসনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং আরো দুঃখের বিষয়, তা আশ্চর্যরকম তথ্য থেকে বিশ্লিষ্ট; কোন কোন ক্ষেত্রে ছায়ার সঙ্গে লড়ে তিনি পরম পরিতৃপ্তি পাবারও চেষ্টা করেছেন। সন্তোষবাবুর প্রতিবাদ-পত্র তাই এক হিসাবে অতিবাদ-পত্রও!

এই পত্রের যথাযথ উত্তর দেবার আগে পত্রদাতার কাছে সবিনয়ে স্বীকার করে নিই, আমি 'শিবপুরে স্থাপত্য-কলা সম্পর্কে পাঁচ বছর পড়াশোনা' করিনি। এ-হেন

পঞ্চবার্ষিকী পাঠক্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে (প্রধানত এই পত্রপাঠের ফলে) বলতে পারি, স্থপতি না হয়েও স্থাপত্যবিচার করা চলে, এবং পৃথিবীতে এমন স্থাপত্য-সমালোচকের দৃষ্টান্ত অনুল্লেখ্য নয়, যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে স্থপতি ছিলেন না। স্থাপত্য-বিচার বলতে অবশ্যই আমি তার নন্দনতাত্ত্বিক বিচার বলছি, ইট-সিমেন্ট চুন-বালি-সুরকির নিরিখের স্থাপত্য-বিচার বলছি না। বেশি দূরে যেতে হবে না, সন্তোষবাবুর চিঠিতে যাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একাধিক বার উল্লিখিত লুই মামফোর্ড-ই তো ব্যক্তিগত জীবনে স্থপতি নন। তাঁর গোড়ার দিককার রচনাগুলি কি ?—স্থাপত্যের সামাজিক ও নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যান নয় কি ? স্থপতি না হয়েও তো মামফোর্ড আজকের পৃথিবীতে প্রখ্যাত স্থাপত্য-সমালোচকদের অন্যতম বলে স্বীকৃত, রয়েল ইন্‌স্টিট্যুট অব ব্রিটিশ আর্কিটেক্‌ট্‌স-এর অনারারী অ্যাসোসিয়েট, আমেরিকান ইন্‌স্টিট্যুট অব আর্কিটেক্‌ট স অ্যাণ্ড টাউন-প্ল্যানিং ইন্‌স্টিট্যুট-এর অনারারী মেম্বার। সন্তোষবাবু বোধ হয় জানেন না কিংবা জানলেও ভুলতে চেয়েছেন যে, স্থাপত্য শুধু বিজ্ঞান বা কারিগরি-বিদ্যা বা পেশা নয়, স্থাপত্য শিল্প হিসাবেও স্বীকৃত। সন্তোষবাবুর জন্য Norwicki-র একটি প্রবন্ধ থেকে : 'Architecture may be considered a science, a profession, a craft, a hobby, a way of life and many other things, *but it is also an art*' (ইটালিকস আমার)। সুতরাং স্থাপত্যকে শিল্প হিসাবে জ্ঞান করেই আমি রাইট সম্পর্কিত আলোচনায় অগ্রণী হয়েছিলাম। স্বনসংকীর্ণতা হেতু রাইট প্রসঙ্গে অনেক কিছুই আমি উল্লেখ করতে পারিনি (সন্তোষবাবু যে দু-একটির উল্লেখ করেছেন, তার চাইতে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় তথ্য আছে) ; ইতিহাসের ছাত্রহিসাবে মার্কিন স্থাপত্যকলার এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ও ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটে রাইট-প্রতিভার আলোচনাই আমার প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দিষ্ট ছিল। দুঃখের বিষয় সন্তোষবাবু এটা ধরতেই পারেন নি। সন্তোষবাবু কি তা হলে জানেন না বা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন যে স্থাপত্যকলা শুধু কারিগরিতেই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু তা হলো 'the product of all sorts of factors—social, economic, scientific, technical, ethnological' (Giedion—Space, Time & Architecture, P, 19) ? তা ছাড়া, আমার প্রবন্ধ এ কালের স্থাপত্যের কারিগরিগত বিচার বিশ্লেষণ নয়, একালের শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের বিশিষ্ট একজনের জীবন ও কাজের আলোচনা মাত্র। স্থাপত্যের শৈল্পিক দিকও যে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ তত্ত্ব সম্পর্কে অচেতন শ্রীসন্তোষ ঘোষ মহাশয় তাঁর প্রতিবাদপত্রের মাধ্যমে শিল্পী এবং রাজ-মিস্ত্রীর চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক প্রভেদটুকুই স্মরণ করিয়ে দিলেন মাত্র।

সন্তোষবাবুর প্রতিবাদ-পত্র, আগেই বলেছি, তথ্য-বিশ্লিষ্ট। স্থাপত্যের ছাত্র হয়ে তিনি স্থাপত্য ও স্থাপত্য-শিল্পী সম্পর্কে এমন কতকগুলি ভুল তথ্য সন্নিবেশ করেছেন, যা স্থাপত্যের ছাত্র মাত্রেরই লজ্জার ও পরিতাপের বিষয়। যেমন, ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট তাঁর মতে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৮ সালে। অথচ লুই মামফোর্ডের (সন্তোষবাবু উল্লিখিত) নিম্নিধ ভাষায়। 'Wright was born in 1868' (The Brown Decades : P. 166)। সন্তোষবাবু লিখেছেন '১৮৬৯ সালের পক্ষেই জীবনীকারদের সংখ্যা বেশি'। এই জীবনীকার কারা ? সন্তোষবাবুর অজস্র পাদটীকা-নামোল্লেখে তাঁরা অনুপস্থিত কেন ? এই জীবনীকারদের মধ্যে কেউ কি 'শিবপুরে স্থাপত্যকলা সম্পর্কে পাঁচ বছর পড়াশোনা' করেছেন ? রাইট তো এখনও জীবিত, জীবৎকালেই তাঁর জন্ম-তারিখ নিয়ে এত গোলমাল ? মামফোর্ড কি তাহলে নিতান্তই অজ্ঞ ?১

সন্তোষবাবু লিখেছেন : 'একদিন নিজেই তিনি বর্ডেন ব্লক বাড়ির ওপরতলায়···' ইত্যাদি। এটি যথার্থ নয়। রাইটের 'আত্মজীবনী' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, বন্ধু উইলকক্সের কাছে ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানের একটি চাকুরীর খবর পেয়ে এবং তাঁর-ই পরামর্শক্রমে রাইট অ্যাডলার ও সালিভানের অফিসে যান। সালিভান উইলকক্সকে বলেছিলেন, রাইটকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বলা বাহুল্য এই 'দেখা করতে বলা'-টাকেই আমি 'আমন্ত্রণ' বলেছিলাম। রাইটের আঁকায় সন্তুষ্ট হয়ে

১। ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের মৃত্যুর পূর্বে এই পত্র রচিত।—স

সালিভান তাঁকে ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানের চাকুরীতে নিযুক্ত কোরেছিলেন। আর অ্যাডলার ও সালিভানের অফিসের বাড়ির নাম 'বর্ডেন ব্লক' নয়, 'বর্ডেন ব্লক'। বাড়ির নাম 'ব্লক' হয় কখনো ?

চতুর্থ স্তবকে সন্তোষ ঘোষ মশাই মার্কিন স্থাপত্যের যুগবিভাগ সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছেন কিন্তু আপত্তির কারণ জানাননি। 'গ্রীক রিভাইভ্যাল' বা 'ক্লাসিক যুগ' শব্দের ব্যবহারে তাঁর আপত্তি কেন বুঝলাম না। 'রেনেসাঁস যুগ' কেন তিনি বলতে চাইছেন ? এই শব্দগুলির সঠিক অর্থ জানা না থাকাতে এই ধরনের গোলমাল দেখা দিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। শব্দগুলির ঐতিহাসিক প্রয়োগ-ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে কি তাহলে তিনি অনবহিত ? ব্যানিষ্টার ফ্লেচারের স্থাপত্য-কলা-সংক্রান্ত মহাগ্রন্থটি তাঁকে পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি। এটি ভালো করে পড়লে তাঁর চিন্তার অস্বচ্ছতা দূর হয়ে যাবে। তাঁর অবগতির জন্য আরো জানাচ্ছি, ফ্লেচারের অনুসরণেই আমি মার্কিন স্থাপত্যের যুগবিভাগ করেছি। সন্তোষবাবুর আন্দাজী 'কোন পুস্তক'টি হলো ফ্লেচারের 'হিষ্ট্রি অব আর্কিটেকচার'।

'লোহার আবিষ্কার' ১৮৬১ সালে নয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে লোহার প্রাচীনত্ব দীর্ঘকালের। সুতরাং 'আবিষ্কার' কি করে হয় ? বোধ হয় তিনি 'ব্যবহার' বোঝাতে গিয়ে 'আবিষ্কার' লিখে ফেলেছেন। 'ব্যবহার'ও যদি তিনি বুঝিয়ে থাকেন তাহলেও ভুল বলতে হবে। কারণ মার্কিন স্থাপত্যকার্যে ঐ বছর অর্থাৎ ১৮৬১র অনেক আগেই লোহা ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রমাণ :

'The beginnings of the skeleton construction of the present day are met with as early as 1848 in the home of the Skyscraper, the United States. The decisive step was the substitution of iron columns for the masonry of the outer walls as a means of suuport for the floors of a building. An early example of this type of construction is a five-storey factory that was erected in New York in 1848. Its builder was the man who invented this method of construction, James Bogardus' (1800---74). Giedion—Space, Time and Architecture—পৃঃ ১১৩-৪।

এই James Bogardus-এর Cast Iron Building—Their Construction and Advantages নামক একখানা বই আছে। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই বইতে তিনি ইম্‌পারসোনেলি অর্থাৎ অন্যের মুখে বলেছেন যে তিনি 'first conceived the idea of emulating the rich architectural designs of antiquity in modern times, by the aid of cast iron'। তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকায় স্থাপত্যকর্মে লোহার ব্যবহার ১৮৬১র অনেক আগেই হয়েছিল। আর আমি মার্কিন স্থাপত্য-কলার বিচার-প্রসঙ্গে যে 'গৃহযুদ্ধের' কথা বলেছি, তা হলো সমাজতাত্ত্বিক বিচার। শিল্পকলার উপর যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রভাব যে কতখানি গভীর হয়, যে কোন শিক্ষিত লোকই তা জানেন। সুতরাং আমার বিচারে ভুলটা কোথায় বুঝলাম না। তা ছাড়া 'চিকাগোর অগ্নিকাণ্ড' মার্কিন স্থপত্যকলায় কোনদিক থেকে এবং কেমন করে কতখানি প্রভাবশীল হয়েছিল বিস্তারিত চিঠিতে সে সম্পর্কে সন্তোষ ঘোষ মশাই একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি।

ওয়েলবর্ণ রুটের নাম করাতে সন্তোষবাবুর আপত্তি। অথচ মার্কিন স্থাপত্যকলা সম্পর্কে যিনি সামান্য পড়াশুনা করেছেন, তিনিই জানেন স্থপতি-প্রতিভা হিসাবে রুটের স্থান মার্কিন স্থপতিদের প্রথম সারিতে। মৃত্যু তাঁর জীবনে অসময়ে ছেদ টেনে না দিলে মার্কিন স্থাপত্য-কলায় তিনি চিরস্থায়ী ও অবিস্মর্তব্যরকমের আরো অনেক বেশি দান রেখে যেতে পারতেন। রুটের নাম আরও যে একটি কারণে করা উচিত তা হলো 'অর্গানিক আর্কিটেকচারে'র গঠন-নির্মিতিতে তাঁর দানও অনুল্লেখ্য নয়। মামফোর্ড বলেছেন, 'These men (অর্থাৎ সালিভান ও রাইট) avoided the pitfalls of romantic archaicism, and historicism and *along with John Welbon Root*, laid the foundation for a truly organic architecture, capable of meeting every practical need and sustaining every ideal, claim of the human spirit' (Sticks and Stones, P. 119-20, ইটালিকস আমার)। 'মনাডনক ব্লক' তাঁর স্থপতি-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন এবং

এর নির্মিতিতে তাঁর অংশই সর্বাধিক (প্রমাণ, "John Root—the constructor of the Monadnock Building." Space, Time and Architecture, P. 380; "In the Monadnock Building.....Root took Richardson's example one step further"—Brown Decades, P. 133-134; "Root abandoned ornament and created a masterpiece of clean masonry and glass, the Monadnock Building, with its uniform brick-front."—Roots of Contemporary Architecture' P. 430). সুতরাং রুট যে অনুল্লেখনীয় স্থপতি এবং তিনি বার্ণহাম ছাড়া কাজ করতে অক্ষম ছিলেন, এ কথা সত্য নয়। বস্তুত বার্ণহাম ছিলেন রুটের সহযোগী অংশীদার, ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের ভাষায় 'great master manager' (Frank Lloyd Wright: A Testament, P. 40). স্বতন্ত্র স্থপতি হিসাবে বার্ণহামের নাম তিনি কোথাও করেন নি। প্রসঙ্গত রুটের স্থাপতি-প্রতিভা সম্পর্কে রাইটের উক্তি উদ্ধৃত করি : The only men indicating genius above engineering ability and the capabilities of front-men were Louis Sullivan and John Root' (Ibid P. 40)। 'engineering ability'র উপরে রুট প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন বলেই কি শিবপুরের পাঁচ বছরের ছাত্র সন্তোষবাবু তাঁর প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেছেন?

সন্তোষবাবু বলেছেন : 'লেখকের মতে মার্কিন পরিবার.....ইত্যাদি। সন্তোষবাবুর এ আপত্তি তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর একপেশেমি, বলা যায়, আবৈজ্ঞানিকতা ও সঙ্কীর্ণতা-সঞ্জাত। সন্তোষবাবু বাড়িকে শুধুই কারিগরির নিদর্শন হিসাবে দেখেন, তার শিল্পগত দিকটায় তিনি পশ্চাদ্দৃষ্টি। মনে রাখা উচিত, শিল্প স্বসমুখ কোন দ্রব্য নয়, মাটির সঙ্গে তার যোগ সহজ নিবিড়; শিল্প যুগের ও গণমানসের নির্ভরযোগ্য দর্পণ। সুতরাং যে কোন শিল্পকৃতির পটভূমি বা মূল্যবিচারে সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নাবলী এসে পড়ে এবং মানুষের জীবনযাত্রাপদ্ধতি, রুচি ইত্যাদি স্থাপত্যকলার মতো ব্যবহারিক শিল্পের বিবর্তনে যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এ কথা আজকের দিনে ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না। এখানে Matthew Norwicki-র একটি প্রবন্ধ থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি: "Humanism may well be considered the main principle of the new movement even though functionalism was its official title. Man and his way of life became the main source of inspiration to a modern architect" এবং "Humanism.....is basic in modern architecture and man's comfort applies to his psychological relations to space as well as to his physical convenience within it" (Roots of Contemporary Architecture নামক সংকলন-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। জনৈক বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে বলেছেন, "Story of modern architecture" শুধু "Story of modern structural techniques" নয়, পরন্তু তা "modern social theories, modern taste"-এর কাহিনীও বটে। সামাজিক কারণের গুরুত্ব সম্পর্কে Henry Russel Hitchcock-এর একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি: "Sociological criteria might have demanded the inclusion of certain categories of construction—notably public housing.—Post-War Architecture, P. 11.

সুতরাং রাইট যে সময় কাজ শুরু করেছিলেন, সেই সময় মার্কিন সমাজজীবন কি রকম ছিল বা রাইটের কাজে পরিবর্তন আসার কারিগরিগত কারণ ছাড়া সামাজিক কি কি কারণ বিদ্যমান ছিল তারই সন্ধান করার চেষ্টা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে কি? কাজেই সন্তোষ ঘোষ মশাই-এর 'এটা মানতে পারা যায় না, ওটা মানতে পারা যায় না' ইত্যাদি হাস্যকর রকমের নিরর্থক। একটা মজার জিনিস তাঁর চিঠিতে দেখছি, যেখানেই বিচার বিশ্লেষণ যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন হয়েছে, সেখানেই তিনি স্রেফ উক্তি করেই চলে গেছেন, আর্ধ ভঙ্গীতে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কথা বলেছেন, উক্তিকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি।

লাওৎজে 'অর্গানিক আর্কিটেকচার'—ঠিক এই জাতীয় কোন শব্দ বন্ধ-কখনো ব্যবহার করেন নি। (সন্তোষবাবু একই সঙ্গে লাওৎজে এবং স্পেংলারকে

'অর্গানিক আর্কিটেকচার'-এর প্রথম প্রবক্তা বলেছেন৯) যাই হোক অর্গানিক আর্কিটেকচার'-এর দূরায়ত কোন প্রতিধ্বনি লাওৎজের রচনায় থাকতে পারে, কিন্তু 'অর্গানিক আর্কিটেকচার' বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, তা সাম্প্রতিক। প্রকৃতপক্ষে ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটই ঐ ধরনের স্থাপত্যরীতির উদ্ভাবক। ('*It was he who first brought the idea of organic structure* defined in the striking formula of his master-teacher to realization: *a new architectural form.* And the sensuous effect of this form has evidently not suffered because the creative instinct was guided by a cognition derived from natural science.....: W. C. Behrendt—Roots of Contemporary Architecture এ সংকলিত প্রবন্ধ থেকে, P. 397. ইটালিকস আমার (কিংবা 'it is understandable that only now) is the organic movement being born on an international plane; hence only now can Frnnk Lloyd Wright be understood, not as an esoteric genius, but as an *initiator of a movement* in which one finds Aalto and the Swede's.....P. 376) আর সন্তোষবাবু লাওৎজের কথাই যদি বললেন, তবে রাইটের গুরু সালিভানের কথা অনুল্লেখিত রাখলেন কেন? রাইটের পূর্বে সালিভানই এ সম্পর্কে ভেবেছিলেন। সালিভানের Kindergarten Chat-s এ তার প্রমাণ বর্তমান।

লাওৎজে বা স্পেংলার কেউই নন, সারত ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের নামের সঙ্গেই 'অর্গানিক আর্কিটেকচার' জড়িত। বিদেশী স্থাপত্যকলার সামান্যমাত্র পড়াশোনা আছে, এমন যে কোন লোকই এ তথ্য জানেন। রাইটই 'অর্গানিক আর্কিটেকচার'-এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। এ বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় অনর্থক।

সন্তোষবাবু 'অর্গানিক আর্কিটেকচার'-এর কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মন্দির-স্থাপত্যকলা সম্পর্কে স্পেংলার-এর কথা পাড়লেন কেন বুঝলাম না। কি এর যৌক্তিকতা বা সার্থকতা?

অতঃপর সন্তোষ ঘোষ মশাই 'অর্গানিক আর্কিটেক-চার'-এর অর্থ বাংলায় বোঝাতে চেয়েছেন। বুঝতে পারলাম না, এর অর্থ আমার বাংলার চাইতে তাঁর বাংলা কোন দিক থেকে বেশি বোঝাতে পেরেছে। তফাৎ এই আমি এক লাইনে যে জিনিসটা বোঝাতে পেরেছি সেইটা বোঝাতে তিনি পাঁচ ছ' লাইন ব্যয় করেছেন। আমার বাংলাটা কি খুব দুর্বোধ্য? তা ছাড়া সন্তোষবাবুর 'অর্গানিক আর্কিটেক-চারে'র বাংলা ব্যাখ্যানতো একটি ইংরেজি ব্যাখ্যানেরই সারানুবাদ। ইংরেজি ব্যাখ্যানটি হলো; As a plant viewed from any angle appears in its full beauty and always offers new charms, so the nature of these buildings can only be experienced by encircling them" (Roots of Contemporary Architecture, P. 399) এ প্রসঙ্গে সেই বইয়েরই আরেকটি জায়গার উদ্ধারণযোগ্য অংশ : "Each house of Wright's is an individual organism, related in every detail to man, alive in itself, friendly to all life and in complete harmony with nature, a growth." এর কারণ রাইটের প্রকৃতি-মগ্নতা। প্রকৃতির কাছ থেকেই রাইট তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন। এবং শুধু রাইট কেন, যে কোন স্থপতিই 'From the study of nature and its formative laws, he gets a firm and definite conception for his architectural creation. He realizes 'how form derives its structure from nature and from the character of the material and its conditions, exactly as a flower forms itself according to the law which lies in its seed.....' (ঐ)।

বেসিন বেসিন সংক্রান্ত ভুল দৃশ্যতঃই মুদ্রণপ্রমাদ। এবং রাইটের পরিচয় দিতে হলে শুধু জনসন কোম্পানির বাড়ি কেন, আরও অনেক বাড়িরই ছবি দিতে পারলে ভালো হয়। আর শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি একটা মস্ত জিনিস, এ সত্যটি মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। ডেভিড রাইটের বাড়ির বিচার প্রসঙ্গে সন্তোষবাবুকে এ

কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আর রাইটের প্রতিভার বৈচিত্র্য (নিম্নরেখ আমার) বোঝাতে ঐ বাড়িটির উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য।

অবাক হলাম সন্তোষবাবুর 'লেখক গুগেনহাইম মিউজিয়মের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু লেখক বোধ হয় জানেন না সে বাড়ির ভিত্তি-প্রস্তরই এখনো স্থাপিত হয়নি। অজ্ঞতাটা হাস্যকর।' (নিম্নরেখ আমার)-এর মতো উক্তিতো আমার ধারণা ছিল, বিংশ শতক বিশেষজ্ঞের কাল ; এবং সর্বাঙ্গীণ বিদ্যা-চর্চার চাইতে বিষয়-বিশেষে গভীরতা অর্জন এ যুগের অধিকাংশে বিদ্যার্থীদেরই লক্ষ্য। সন্তোষ ঘোষ মশাই-র চিঠি আমার এই ধারণাকে কিছুটা শিথিল-ভিত্তি করলো এবং এ রকম আর দু-চারটে দৃষ্টান্ত তাকে নিভিত্তিক করার পক্ষে যথেষ্ট। দেখছি, সন্তোষ ঘোষ মশাই (যিনি নিজেকে রাইটের সম্পর্কে অভিজ্ঞ বলে মনে করেন ; প্রতিবাদ-পত্রের পাদটীকায় রাইট-বিষয়ক স্বরচিত দু-টি প্রবন্ধেরও উল্লেখ করেছেন) নিজে স্থপতি হয়েও বর্তমান জগতের অন্যতম স্থপতিশ্রেষ্ঠের হালের কাজকর্মের কোন খবরাখবরই রাখেন না। প্রতিবাদ-পত্র লেখকের অবগতির জন্য বলি, গুগেনহাইম মিউজিয়ম সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় সমাপ্তির পথে। এটি আরও আগে সমাপ্ত হবার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণ বশত তা শেষ হতে বিলম্ব হয়। আর 'USIS Feature' নামক বুলেটিনের পুরোণ যে সংখ্যাটি আমি দেখেছিলাম তাতে ছিল : "Currently under construction is NewYork's first Wright building—a museum that promises to be as original as anything he has ever done." ঐ বুলেটিনে আরো ছিল 'his circular, spiralling art-museum—to be one of the most extraordinary public buildings in the United States—will be completed within two years' মোট কথা সে-মিউজিয়াম এখন সম্পূর্ণ হোয়ে গেছে। কাজেই নিজে নিশ্চিত হয়ে আমার ভুল ধরতে আসা সন্তোষবাবুর উচিত ছিল। আমি শিবপুরে স্থাপত্যবিজ্ঞান (স্থাপত্যশিল্প বলতে ভয় হচ্ছে !) নিয়ে পাঁচ বছর পড়াশোনা করিনি, সুতরাং স্থপতিপ্রবর সন্তোষ ঘোষ মশাইর অজ্ঞতায় কেবল অনুকম্পায়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়।

'কুনলি হাউস,' সন্তোষবাবুর পছন্দ নয়। কেন পছন্দ নয়, তা অবশ্য জানান নি। পুনরায় বলি, শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি একটা মস্ত জিনিস। তবু সন্তোষবাবুর অবগতির জন্য 'কুনলি হাউস' সম্পর্কে রাইটের নিজেরই মন্তব্য উদ্ধৃত করছি : "I put my best into the Coonley house. Looking back upon it, I feel now that the building was the best I could then do in the way of a house." (Autobiography P. 161). ঐ বইয়ের ঐ পাতাতেই রাইট 'কুনলি হাউস'কে 'most successful of my houses' বলে বর্ণনা করেছেন। এই বাড়িটি সম্পর্কে 'House Beautiful' নামক বিশেষজ্ঞ পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী এলিজাবেথ গর্ডনের মন্তব্যও উদ্ধারণযোগ্য : "In all my years of searching for houses worth holding up as examples from which to learn, I have never been so completely satisfied (for that is a better word) as with this *magnificent house. It is a great work of art, the epitome of shelter. Here, in one residence, art and life come together. Here, form and function are inseparable, and we can see clearly what is meant by the principles of architecture to which Wright has dedicated himself all his many years.*" (ইটালিকস আমার)।

সন্তোষ ঘোষ মশাই Giedion-এর উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে রাইটের বাড়িতে আলো-হাওয়ার নিদারুণ অভাব। এটি ঠিক নয়। প্রথমত, Giedion-এর উক্তি পূর্ণত উদ্ধৃত হয়নি বলে কিছুটা অর্থ-বিভ্রম ঘটেছে। এতে মনে হচ্ছে, আলো-হাওয়ার অভাব রাইটের অক্ষমতা-জনিত, রাইট মানুষকে নিছক জীবমাত্র জ্ঞান করে আলো-হাওয়া থেকে সরিয়ে রাখতে চান (এখানে বলা ভালো, হাওয়ার প্রাচুর্য বাঞ্ছনীয় মানে

২। অত কষ্ট করারও প্রয়োজন হবে না। ১৩ই এপ্রিল ১৯৫৯-র Time পত্রিকায় মিউজিয়মটির ছবি বেরিয়েছে। এই পত্র যখন লেখা হয়েছিল তখন সংগ্রহ করা হয়ে ওঠে নি।—লেখক

এই নয়, কনকনে ঠাণ্ডা বা ভ্যাপসা গরমের হাওয়াও কাম্য কিংবা আলোর প্রাচুর্য মানে নয় সর্ব সময় কটকটে রোদ্দুরের প্রাচুর্য এবং আলো-হাওয়ার অভাব রাইটের বাড়ির বৈশিষ্ট্য। প্রথম দিককার বাড়িতে কেন অপেক্ষাকৃত (নিম্নরেখ আমার) কম আলো-হাওয়া ছিল তার কারণ বুঝতে হলে রাইটের সেই সময়কার দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিক অবস্থার কথা জানা দরকার। Giedion এই অবস্থা অনুমান করার চেষ্টা করতে গিয়ে বলেছেন : "Is there back of this the desire for shadowed dimness that prevailed in the late 19th century or is it an urge toward primitive eternal instincts which sooner or later must be satisfied !" এবং "Always in the study of Wright's personality a distinction must be made between his use of elements belonging to his generation, on the one hand and on the other, his own genius, overlapping its natural frontiers." (P. 415) দ্বিতীয়তঃ, রাইটের বাড়ি তৈরির মূল নীতিই হলো : "Wright binds the human dwelling to the earth as intimately as possible, introducing the earth into the house in the form of rough walls and attached to it as if, in the words of Louis Sullivan, by 'ten-fingered grasp of reality." তা ছাড়া, একজন শিল্পীর প্রথম জীবনের কর্মকৃতিত্বে তাঁর একমাত্র বা চূড়ান্ত পরিচিতি নিহিত নয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' বা 'ভানুসিংহের পদবলী' কি রবীন্দ্র-প্রতিভার সার্থকতম বা চূড়ান্ত পরিচায়ক ?

অন্য পক্ষে, "Wright treats light as if it were a natural building material. The graduated inter-play of light and shade is to him an artistic medium of expression..... And similarly the air is evaluated as an element of form, is drawn into the concept of building." মামফোর্ড বলেছেন : "He introduced sunlight and the glass-opening, to take the place of the opaque and light-belittling wall". (Brown Decades P. 170-'71) রাইট সম্পর্কে আরেকটি উদ্ধারণ-যোগ্য উক্তি : "Wright's architecture has always been grounded in the emotional experience of space, light and materials and each of his buildings offer it with a resourcefulness that transcends the merely imaginative." (Post-war Architecture : Arthur Drexler).

আমি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের 'বৃত্তাকার অর্ধবৃত্তাকার ধরনের কামরা'র কথা বলেছিলাম তার কারণ প্রথাসিদ্ধ চৌকো কামরার ধারণার বিপরীত মেরুতে বৃত্তাকার কামরার ধারণা। পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ কামরার উল্লেখের চাইতে বৃত্তাকার ধরনের কামরার উল্লেখ আগে প্রয়োজনীয়। এখানে বলা ভালো, অনুল্লেখ আর অজ্ঞতা এক জিনিস নয়। সন্তোষবাবু অবকাশ পেয়েও রাইট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই উল্লেখ করেন নি।

আমি যা বলিনি, তার উপর প্রাসাদ নির্মাণ করে স্থপতি সন্তোষবাবু তা ভাঙবার চেষ্টা করেছেন একাধিক জায়গায়। যেমন, প্রবন্ধের কুত্রাপি আমি বলিনি রাইট উঁচু বাড়ি তৈরি করেন না বা করতে পারেন না। আমার প্রবন্ধে আমি রাইটের Commercial buildings-এর চাইতে Domestic Architecture-এর উপরই জোর দিয়েছিলাম। চিকাগোর ৫,২৮০ ফিট উঁচু ৫১০-তলার বাড়ির নক্শা রচনায় রাইট ব্যস্ত আছেন, এ খবর নতুন নয়। যদি এ বাড়ি কোনদিন নির্মিতও হয়, তবু তাকে প্রতিভার লীলাবৈচিত্র্য বলেই গণ্য করা উচিত। কেন ৫১০-তলার সম্ভাব্য বাড়িটিকে 'অর্গানিক আর্কিটেকচারের যোগ্যতর উদাহরণ' (নিম্নরেখ আমার) বলা যায়, সন্তোষ ঘোষ মশাই তা জানান নি। যে বাড়ির নক্শা আমরা কেউই দেখিনি, তার সম্পর্কে এবংবিধ দায়িত্বহীন উক্তি বোধ হয় সন্তোষবাবুই করতে পারেন। সন্তোষবাবু যদি রাইটের সঙ্গে বসে এই নক্শা প্রণয়ন করে থাকেন, তা হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা ! 'শেষের কবিতা' যেমন রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বা একমাত্র পরিচায়ক নয়, তেমনি এই সম্ভাব্য বাড়িটিও রাইটের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে গণ্য হবে না।

ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের স্কাইস্ক্রেপার-বিরোধী মানসতা

হৃদয়ঙ্গম না করলে তাঁর শিল্পপ্রতিভার বিচার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য ; এবং সন্তোষবাবু তা আদপেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি, The Future of Architecture নামক গ্রন্থে 'The Tyranny of the Skyscraper' শীর্ষক যে অধ্যায়াংশ আছে তাতে রাইটের স্কাইস্ক্রেপার-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

"...they (অর্থাৎ Skyscrapers) do not materialize as architecture. Empty of all other significance, seen from a distance something like paralysis seems to stultify them. They are monotonus. They no longer startle or amuse.

Skyscraper architecture is a mere matter of a clumsy imitation masonry everywhere for a steel skeleton. They have no life of their own—no life to give, receiving none from the nature of construction. No, none. And they have no relation to their surrondings. Utterly barbaric, they rise regardless of special consideration for environment or for each other, except to win the race and get the tenant. Space as a becoming psychic element of the American city is gone. Instead of this fine sense is come the tall and narrow structure. The skyscraper envelope is not ethical, beautiful or permanent. It is a commercial exploit or a mere expedient. It has no higher ideal of unity than commercial successes." (P. 164).

উদ্ধৃতাংশের পশ্চাৎপটেই—'তাঁর এই প্রকৃতি-মুখিনতা বা প্রকৃতিমগ্নতা, বলা বাহুল্য, আকাশস্পর্শী স্কাইস্ক্রেপারের আমেরিকায় একটি ব্যতিক্রম-প্রোজ্জ্বল ঘটনাবিশেষ'—আমার এই উক্তির তাৎপর্য বর্তমান। অবশ্য আশঙ্কা করছি, সন্তোষবাবু এ পড়েও হয়তো স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলবেন, 'এ কথার অর্থ অন্য'।

উদ্ধারণ-চিহ্নান্তর্গত উক্তিতে লক্ষণীয়, 'আকাশস্পর্শী' শব্দটা 'স্কাইস্ক্রেপারে'র বাংলা নয় এবং তা বিশেষ্যপদ নয়, বিশেষণ। 'স্কাইস্ক্রেপারের আমেরিকা' এই সমগ্র অংশটিকে তা বিশেষিত করছে ; স্বভাবতঃই রাইটের প্রকৃতিমগ্নতাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরবার জন্যই এটি করা হয়েছে।

এবার চিঠিটির অস্বচ্ছ চিন্তা-প্রসূত অদ্ভুত কথা-ভর্তি অংশটিতে আসা যাক। বিদেশী স্থাপত্যকলা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিমাত্রেই জানেন রাইট মূলত এবং মুখ্যত প্রকৃতিপ্রেমী শিল্পী, প্রকৃতির সঙ্গে স্বীয় শিল্পকর্মের নিবিড় বন্ধন-স্থাপনই তাঁর প্রধানতম অন্বিষ্ট। অন্য পক্ষে 'কোর্বুজিয়ে প্রকৃতিকে পরিহার করে চলেন'-এর অর্থ গাছপালা, ঝর্ণা, নদী, পাহাড় পর্বত ইত্যাদির সাযুজ্যে স্বীয় শিল্পকৃতির স্থাপনার জন্য কোর্বুজিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। বাড়ির সঙ্গে খানিকটা খোলা জায়গা, দু-চারটে লতা-পাতা সংযোজনা করলেই প্রকৃতিপ্রেমী বা প্রকৃতি-নির্ভর স্থপতি হয় না। প্রকৃতির প্রতি ছিটে-ফোঁটাও প্রেম নেই, এমন অনেক ঘোর বাস্তববাদীকেও বাড়ি তৈরি করার সময় কয়েক বর্গফুট উঠোন করতে আর দু-চারটে লতা-পাতা লাগাতে দেখা যায়। তা দ্বারা কি প্রমাণ হয় ? তা ছাড়া, কোন শিল্পীকে প্রকৃতি-বিমুখ বললে কি তাঁকে অপমান করা হয় ? প্রকৃতি-বিমুখতা বৈশিষ্ট্য, দোষ নয়। কোন Realist কবি বা শিল্পীকে 'Romantic নন' বলে যদি বর্ণনা করা হয়, তা হলে কি তিনি ছোট হয়ে গেলেন ? এ কেমন যুক্তি ?

যাই হোক রাইটের প্রকৃতিমগ্নতা এতই জানা জিনিস এবং সে সম্পর্কে এত আলোচনা হয়েছে যে তা আর বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার প্রবন্ধেও আমি সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবং রাইটের স্কাইপেস্ক্রার-বিরোধী মনোভাবও (যা আমি পূর্বে তাঁর মতামত তুলে দেখিয়েছি) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রাইটের শিল্পকর্মে প্রতিবেশ শুধু পটভূমির কাজই করে না, তা শিল্পকর্মের সঙ্গে একাত্মও। একজনের উক্তি :

"Wright is the first architect to whom the atmosphere is more than mere background to his work. He uses it, he calculates with it, again and again he tries to relate his work so finely with the atmosphere that both must seen indissolubly connected." (Roots of Contemporary Architecture). রাইটের বাস্তুস্থাপত্যের বিশেষত্বই এই যে তা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম, মনে হয় মানুষ নয় প্রকৃতিই তার নির্মাণশিল্পী। Giedion-এর ভাষায়, "they seem to grow into nature and out of it."[৩] এইজন্যেই "Wright prefers to use materials taken directly from nature, rugged stone walls, rough granite floors and heavy unfinished timbers". (P. 414). রাইটের বসত-বাড়িগুলি এমনভাবে প্রকৃতির সঙ্গে ঘন, সন্নিবিষ্ট পরি-বেশের সঙ্গে এমন ভাবে তারা মিশে থাকে যে অনেক সময়ই কোথায় তাদের শুরু তা বলা শক্ত হয়ে পড়ে।

কোর্বুজিয়ে, সন্তোষবাবু লিখেছেন, Open space-এর পক্ষপাতী। Open space-এ পক্ষপাতিত্ব এবং প্রকৃতিমগ্নতা কিন্তু এক জিনিস নয়। বনের মধ্যে বা ঝর্ণা হ্রদ পুষ্করিণীর ধারে কোর্বুজিয়ে ক'টা বাড়ি তৈরি করেছেন ? রাইটের অধিকাংশ স্থাপত্যকর্মে যে কাব্য-ধর্মিতা বা কাব্যগুণ (যে জন্য আমি রাইটকে কবি-স্থপতি বলেছি এবং যাতে সন্তোষবাবুরও কোন আপত্তি নেই) বিদ্যমান, কোর্বুজিয়ের ক'টা বাড়িতে পরিলক্ষিত হয় ? এই মৌলিক তফাতটি আমি প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম, কোর্বুজিয়ের কাজের বিশ্লেষণ আমার প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট ছিল না। দুঃখের বিষয়, সন্তোষ ঘোষ মশাই তা ধরতে পারেন নি। আর সন্তোষবাবু রাইট এবং কোর্বুজিয়ে সম্পর্কে যা বলেছেন তা তাঁর নিজস্ব, কোন প্রামাণিক গ্রন্থভিত্তিক নয়। (Giedion, Mumfordএর সঙ্গে নিজের রচনাকে প্রামাণিকতার মর্যাদা দিয়ে উল্লেখ করার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ভাগ্যিস সন্তোষ ঘোষ সাহিত্যিক নন, নতুবা রবীন্দ্রনাথকেও হয়তো তাঁর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে হতো !) কোর্বুজিয়ে এবং রাইটের তফাৎ সম্পর্কে রিচার্ডস যা বলেছেন, তা আমার মতের সঙ্গে অভিন্ন। আমার প্রবন্ধে তা আলোচিত হয়েছে বলে এখানে আর উল্লেখ করলাম না। আর স্তম্ভের উপর বাড়ি তৈরি করেন বলে কিন্তু আমি কোর্বুজিয়েকে প্রকৃতিবিমুখ বলিনি। রাইটের বাড়িগুলি, উপমার আশ্রয়ের সাহয্যে বলেছিলাম, তারা যেন পৃথিবী-মায়ের সন্তান। প্রসঙ্গত, সন্তোষবাবু রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে উপমা দিয়েছেন ন্যায়ের ভাষায় তার ইংরেজি নাম False Analogy এবং আমার প্রবন্ধের বক্তব্য বুঝতে না পারার দরুণই তার অপজন্ম।

অতঃপর আসা যাক সন্তোষ ঘোষ মশাই-র প্রাসঙ্গিক ও খুচরো মন্তব্যে। তিনি রিচার্ডস বেচারার উপরও এক হাত নিয়েছেন। রিচার্ডসের বই সম্পর্কে তিনি Fortnightly Review-র বিরূপ মন্তব্য উদ্ধার করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বইটা বাজে এবং তা থেকে আমার কোন সাহায্য নেওয়া উচিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে আমার দু'টি বক্তব্য : প্রথমত, তত্ত্ব-তথ্যের ভিত্তি ব্যতিরেকে অন্য কারো মন্তব্য উদ্ধার করে কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না ; এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরের মুখের ঝাল খাওয়াটা মানসিক স্বাস্থ্যের দুর্লক্ষণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়।

অবনীন্দ্রনাথকে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা রবীন্দ্রনাথকে এক সময় কয়েকজন সমালোচক নিন্দা ভর্ৎসনা করে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। তা বলে কি রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্র-নাথ ছোট হয়ে গেছেন ? দ্বিতীয়ত, রিচার্ডসের মত অগ্রহণীয় নয়, কারণ সন্তোষবাবুর মতো তিনিও লণ্ডনের একটি বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পড়াশোনা করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে স্থপতির কাজও করেছিলেন। রিচার্ডের বই থেকে যে অংশ আমি উদ্ধৃত করেছি সন্তোষবাবু তার অর্থ অন্য বলে জানিয়েছন। কিন্তু অন্য অর্থটি কি ?

ভাষা এবং উচ্চারণ ইত্যাদি বিষয়ে কথা না বললেই বোধ হয় ভালো করতেন সন্তোষবাবু। স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকার যদি একমাত্র স্থপতির হয় তবে ভাষা বা সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করার অধিকার একমাত্র সাহিত্যিকের ও সাহিত্য-সমালোচকের-ই, অন্য কারো নয়। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলা ভাষা সম্পর্কেও কথা বলতে হবে, এ কেমন আবদার ? আর ভাষা সম্পর্কে ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়ে অন্যের ভাষা সম্পর্কে কথা বলতে যাওয়া অবিমৃষ্যকারিতা নয় কি ? যেমন, সন্তোষবাবু 'অবহিত' লিখতে গিয়ে লিখেছেন 'অভিহিত', 'আবিষ্কার' বানান লিখেছেন 'আবিস্কার',

৩। প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রকৃতির কোলেই নিজের শিল্পকর্মের সংস্থাপনার বৈশিষ্ট্য Hans Arb প্রমুখ ভাস্করদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

'উদ্ধৃতি দিয়েছেন'-এর স্থলে লিখেছেন 'উদ্ধৃতি করেছেন, 'প্রতিশব্দ' বলতে তিনি 'ট্রান্সলিটারেশন' বোঝেন, জমিন ও জমি (ফার্সী জমীন, অর্থ ভূমি)-র মধ্যে পার্থক্য দেখেন ইত্যাদি। স্ব-নির্মিত যে কয়েকটি নতুন শব্দ আমি প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি, সন্তোষবাবুদের পক্ষে তাদের নবীন দীপ্তি অসহ ঠেকতে পারে। কিন্তু 'কিছু-কিঞ্চিৎ'-আদি শব্দ তো বহু-ব্যবহৃত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইদানীংকালে বাংলাসাহিত্যে দেখা গিয়েছে, রাজমিস্ত্রী ছুতোরমিস্ত্রী থেকে শুরু করে অভিনেতা অভিনেত্রী সকলেই বইপত্তর লিখছেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় মতামত প্রকাশ করছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কোন পাঁচসালা পাঠক্রম না থাকার ফলেই কি অনাথ বাংলাভাষার এই দুর্দশা!

উচ্চারণ বিষয়ে কথা বলতে গিয়েও সন্তোষবাবু গোলমাল করে ফেলেছেন। Sullivan সুলিভান সালিভান দুই-ই হয়; এ ব্যাপারে USIS-এ খোঁজ নিলে জানতে পারতেন তিনি। Illinoisএর উচ্চারণ ইলিনয়স নয়, ইলিনয়; আমার মূল প্রবন্ধেও ইলিনয়স—যা মুদ্রণ-প্রমাদবশত ইলিয়নস হয়েছে—ছিল এবং তা ভুল; সন্তোষবাবু ভুলের উপর ভুল করে বসে আছেন। Kauffman ক্যফম্যান নয়, যথার্থত কফ্‌ম্যান, Le Corbusier লে কোর্ব জিয়ে, ল্য কুরবশিয়ে বা লে কর্বুজিয়ে নয়; আর Le-র উচ্চারণ একই সঙ্গে লে এবং ল্য (নিম্নরেখ আমার) হয় কি করে?—Les—ল্য, Le—লে।

সাহিত্যিক মাত্রেই যেমন সাহিত্য-সমালোচক নন, স্থপতি মাত্রেই তেমনি নন স্থাপত্য-সমালোচক। শীতশেষের একটি বিষণ্ণ বিকেলে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্থাপত্যবিদ্যার পাঁচসালা পাঠক্রমের এবং সন্তোষ ঘোষের এই প্রতিবাদ-পত্র পড়ে ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের একটি উজ্জ্বল উপদেশ মনে পড়ছে, "Beware of the architectural school except as the exponent of engineering."

ইতি

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

পল রোবসন

সাধন চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসাহী সাধন চট্টোপাধ্যায় পেশায় লেখক না হলেও প্রায়শই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকেন। বর্তমান রচনায় তাঁর প্রগাঢ় শিল্পানুভূতি ও তার সুষ্ঠু প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যাবে। বর্ত্তমানে একটি অগ্রণী প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ওথেলোর ভূমিকায় রোবসন।

পল রোব্‌সন নামের অর্থ গিরি-শ্রেষ্ঠ হোলে অশোভন হোতো কি? দৈহিক বিরাটত্বকে বাদ দিলেও, তাঁর বিরাট প্রতিভার কথা স্মরণ কোরে এ-অর্থ আভিধানিক হোতে বাধা নেই।

বর্তমান শতকে পল রোব্‌সনের মতো প্রতিভার সংখ্যা সত্যই বিরল।

রোব্‌সন নামটি উচ্চারিত হোলেই শঙ্খনিনাদী এক বিরাট গায়কের ছবি ভেসে ওঠে। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই অভিনেতারূপে রোব্‌সনকে দেখতে পাই। আর দেখতে পাই 'ওথেলো'র ভূমিকায় বিরাট এক 'মূর'কে—সেই-ই প্রকৃত রোব্‌সন। মনে হওয়া স্বাভাবিক সেক্সপীয়র যেন পল রোবসনকে ভেবেই 'ওথেলো' লিখেছিলেন।

শুধু শিল্পী হিসাবেই কি তাঁর সাফল্যের পরিচয়? খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁর খ্যাতির অন্ত নেই।

রোব্‌সনের দ্বন্দ্বমুখর কর্মময় জীবন ও চরিত্র পর্যালোচনায় এ-সহজ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে—সত্য, সরলতা ও শিল্পের পূজারী রোবসন।

রোব্‌সনকে তাঁর পিতার চরিত্র বিশেষ কোরে প্রভাবান্বিত কোরেছে—"একথা রোবসন বহু প্রসঙ্গে উল্লেখ কোরেছেন। 'যিনি আমার জীবনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত কোরেছেন, তিনি আমার পিতা, রেভারেণ্ড ডু রোব্‌সন আমার আশ্চর্যরকমের ভালো ও

দরদী পিতা।" এ-হেন পিতার কিঞ্চিদ্ পরিচয় প্রাসঙ্গিক।

মুক্তি-প্রত্যাশী এক নির্যাতিত ক্রীতদাস উইলিয়ম ড়ু। মনিবের অগোচরে উত্তর ক্যারোলিনা থেকে হারলেমে এসে উপস্থিত হন তিনি—বিত্তহীন, রক্তিহীন ড়ু বহু শ্রমে নিজ চেষ্টায় শিক্ষিত হোয়ে পাদ্রীর পেশা গ্রহণ করেন। নিগ্রো সমাজে, এমনকি শ্বেতকায়দের মধ্যেও ড়ু জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই পুরোহিতেরই পুত্র পল রোবসন। অসত্যের প্রতিবাদ, সত্যকে গ্রহণ আর সমাজকে উন্নত করা—এই তিন প্রতিজ্ঞা দ্বারা তিনি পিতা কর্তৃক আবদ্ধ হন। পিতার শিক্ষায় তাঁর চারিত্রিক ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হয়।

গায়ক হিসাবেই শুধু স্বজনী-প্রতিভার পরিচয় দেন নি, অভিনেতা হিসাবেও তাঁর প্রতিভার দূর ব্যাপ্ত। ১৯২৮, ১৯৩০ ও ১৯৩৪ সালে গ্রেট ব্রিটেন সফরকালে রোবসন তাঁর অভিনয়-দক্ষতার স্বাক্ষর জনমানসে কতো গভীরভাবে অঙ্কিত রেখেছেন তা তৎকালীন সব পত্র-পত্রিকার উক্তিতে ব্যক্ত: "দানবীয় আকৃতির নিগ্রো অভিনেতা দর্শকমণ্ডলীকে নির্বাক, নিস্তব্ধ করেন।" "কী অপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, তুলনাবিহীন কণ্ঠস্বর," ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিজাত সম্প্রদায়ের বৈঠকে, রেস্তরাঁর নৈশ আড্ডায় সর্বত্র পল রোবসন সম্পর্কিত আলোচনা চলেছিল। লণ্ডনের আকাশ-বাতাস পল রোবসনের নামে মুখরিত হোয়ে উঠেছিল।

ইংলণ্ডে রোবসন প্রথম সুনাম অর্জন করেন 'ওথেলো'র ভূমিকা অভিনয়ে। 'ওথেলো'র ভূমিকায় অভিনয় প্রসঙ্গে রোবসন নিজেকে সেক্সপিরীয় সাহিত্য পাঠে সমাহিত করেন। তারপর তিনি অধিকতর সুনাম অর্জন করেন ইউজিন ও'নিলের 'অল গড্‌স চিল্লান গট উইংগ্‌স' নাটকে 'জিম হ্যারিস'-এর চরিত্র অভিনয়ে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক আইভর ব্রাউনের উক্তি সমর্থনযোগ্য: 'এই চরিত্রে (জিম হ্যারিস) রোব্‌সন প্রমিথিউসীয় বেদনাকে রূপায়িত করেন।...মিঃ রোবসন রাত্রির পবিত্রতা নিয়ে কলুষতার ঊর্দ্ধে বিচরণ করেন।' বলা বাহুল্য এই অভিনয়ে তাঁর খ্যাতি শুধু লণ্ডনে নয় অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও বিস্তারিত হয়।

নাটকের বিষয়বস্তুর অভিনবত্বও দৃষ্টি আকর্ষণের আরো একটি প্রধান কারণ ছিল। বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ: একটি কৃষ্ণকায় বালক আর শ্বেতকায় বালিকা একই পল্লীতে একত্রে মেলামেশা কোরে বড় হোয়ে ওঠে। পরোক্ষে তাদের মধ্যে এক প্রীতির সম্পর্ক দানা বাঁধে। তথাপি এই তরুণী এক শ্বেতকায় যুবকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। স্বল্পকালের মধ্যে তরুণী স্বামী পরিত্যক্তা হোয়ে ফিরে আসার পর এক প্রতিকূল জীবন-যাপন কোরতে বাধ্য হয়। এহেন অবস্থায় সেই কৃষ্ণকায় যুবক শ্বেতকায় তরুণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। বর্ণ বৈষম্য তরুণীকে মনের মধ্যে অগোচরে প্রতিক্রিয়া শুরু করে। তরুণী লাঞ্ছিত করে তার নতুন স্বামীকে। স্বামীর চোখে পবিত্র ভালোবাসার আলো জ্বলে ওঠে। নিজেকে সে সংযত রাখে লাঞ্ছিত হোয়েও। ব্যবহারে তার কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না।

এই কৃষ্ণকায় যুবকের (জিম হ্যারিস) ভূমিকায় রোবসন অভিনয় করেন। সে নাকি অপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব অভিনয়!

গায়করূপে যেখানেই পলের উপস্থিতি, সেখানেই যেন আগে থেকেই তাঁর অভিনন্দন আর প্রশস্তির ব্যবস্থা হোয়ে থাকে।

গায়ক হিসাবে বিচার কোরতে গেলে রোব্‌সনকে লোকসংগীতের সাধক বোলে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। তিনি নিজেই ক্লাসিক গায়ক হিসাবে নিজের পরিচয় দিতে নারাজ।

১৯৩৪ সালের ইংলণ্ড সফরকালে রোবসন লোক-সংগীতের মাধ্যমে ইংলণ্ডবাসীকে মুগ্ধ করেন। "রোব-সনের অভিনব গায়ন-পদ্ধতি—রাস্তার লোকের জন্যই যেন তাঁর গাওয়া—লোকসংগীতের রীতিতে এ-ধরনের গান লিভারপুলে সত্যই খুব জনপ্রিয়।" লিভারপুল, লিস্টার, ম্যানচেস্টার প্রভৃতি শ্রমিক-অধ্যুষিত অঞ্চলে রোবসনীয় সংগীত খুবই সমাদৃত হয়।

ম্যানচেস্টারের একটি তাঁত কলের জনৈক শ্রমিক পুত্র রোবসনের গান শুনে তাঁকে একটি আকো দীপ্ত প্রশস্তি পত্র পাঠিয়েছিলেন এই পত্র প্রাপ্তিতে রোব্‌সন বোলেছিলেন "এই লোকটি বোলছেন, আমার গান বুঝেছেন। কারণ আর কিছুই নয়, আমার বাবা দাসত্ব

সপরিবারে আনন্দোজ্জ্বল রোবসন

কোরেছেন আর এর বাবা শ্রমিক হিসাবে ম্যানচেস্টারের কলে কাজ কোরছেন। এঁর চিঠি আমার হৃদয় স্পর্শ কোরেছে।" এ-থেকেই উপলব্ধি করা যায়, জনমানসে তাঁর স্থান কতো ওপরে।

যৌবনের প্রথমাংশে রাজনীতি রোবসনের কাছে অবোধ্য ছিল, রাজনীতিতে আস্থাহীন ছিলেন তিনি। শিল্পীর নিজের কথায় 'আমার প্রদেশ হলো শিল্প'। কিন্তু শিল্পীর দুর্ভাগ্য রাজনীতি তাঁর মহৎ জীবনকে বিড়ম্বিত কোরলো।

বর্ণসমস্যা তাঁর কাছে শুধু ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। "আমি উপলব্ধি কোরেছি আমার আমেরিকাবাসী নিগ্রো-দের লড়াই আর সারা দুনিয়ার নির্যাতিত শ্রমিকদের লড়াই একই জিনিস।" আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদের জীবন-সংগ্রামে রোব্‌সন অংশীদার ছিলেন। আফ্রিকার ব্যাপার নিয়ে তিনি ব্রিটেনের ধুরন্ধর ব্যক্তিদের সঙ্গে বহুবার সাক্ষাৎও কোরেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এসব ব্যাপারকে কেন্দ্র কোরে বার্ণার্ড শ, এইচ্, জি, ওয়েলস প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

আমেরিকার নিগ্রোদের ধর্মীয় গান গেয়ে রোবসন জনপ্রিয় হোয়েছিলেন এইটুকু মাত্র। তাঁর প্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করা দূরে থাকুক পরন্তু শিল্পী প্রচুর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হোয়েছেন। এতদ্‌সম্পর্কে শিল্পীর ক্ষোভ অপরিসীম। "আমেরিকার বর্ণ-সমস্যার স্বরূপ বাইরের লোকদের কাছে বোঝানো অসম্ভব। বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে এটা বুঝতে হবে।" এটা রোবসনেরই উক্তি।

পরবর্তী জীবনে রোবসন তাঁর গায়ন-পদ্ধতি পরিবর্তন কোরতে বাধ্য হোয়েছিলেন, আর তাঁর গানের ভাষা হোয়েছিল তাঁর জাতির ভাষা, নিপীড়িত জনগণের ভাষা।

লোকসংগীত চর্চাকালে পল ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং ন্যূনাধিক পঁচিশটি ভাষায় বুৎপত্তি লাভে সফল হন। যে-কোন প্রখ্যাত ভাষাবিদের পক্ষে এতগুলি ভাষায় বুৎপত্তিলাভ গর্বের বিষয়।

পরবর্তী জীবনে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সুনজরে না থাকায়, রোবসনকে বিরাট আর্থিক সংকটে কালযাপন কোরতে হোয়েছিল। তথাপি শিল্পী তাঁর উন্নত শির নত না কোরে তাঁর অনুপম কণ্ঠস্বরে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আকাশ বাতাস মুখরিত কোরে জানিয়েছিলেন:

Out of the cheating, out of the shouting
Out of the murders and lynching,
Out of the windbags, the patriotic spouting.
Out of uncertainty and doubting and
Out of the carpet-bag and the brass-spittoon
It will come again—Our marching song will come again
Simple as a hit tune, deep as our valleys,

High as our mountains, strong as the people
who made it.
For I have always believed it,
And I believe it now,
And who I am ?

AMERICA

তথাপি দুঃখের বিষয় রোবসনের সরকার তাঁকে আমেরিকান হোতে দেন নাই। পরন্তু আমেরিকার বাইরে যাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরেছিলেন। এতদ্‌সম্পর্কে বিখ্যাত সেক্সপিরীয় সমালোচক ডোভার উইলসনের প্রবন্ধে (লণ্ডন টাইম্‌স পত্রিকা—দশই মে উনিশশো সাতান্ন) পাওয়া যায়; "আমরা আমন্ত্রণ জানাই সেই বিখ্যাত আফ্রিকার অনুপকণ্ঠ ভদ্রলোককে আমাদের দেশে পুনরায় শুভাগমন কোরতে, আমাদের গান শোনাতে, সর্বোপরি আমাদের কাছে সেক্সপীয়রের সেই নিগ্রোবীরের চরিত্র ব্যাখ্যা কোরে শোনাতে—যে চরিত্র সেক্সপিরীয় ট্রাজেডির মহত্তম নায়ক।

"যে কোন কারণেই হোক আমরা সাধারণ লোক বুঝতে অক্ষম কেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে মুক্তির মূর্তির বাইরে অতলান্তিক অতিক্রম কোরতে অস্বীকৃত। যদি তাঁরা ভীত হন যে পৃথিবীর রক্ষণশীল জাতির রাজনীতি কলুষিত হবে তাঁকে ছেড়ে দিলে, এ-আশঙ্কা অমূলক। আমরা মিঃ রোবসনকে বৃথাই কালক্ষেপণের অবকাশ দেব না এসব তুচ্ছ ব্যাপারে। আমরা তাঁর সময় ধর্মীয় ও অন্যান্য গান গেয়ে কাটাবার জন্যে চাই, আমরা তাঁর মুখ থেকে সেই অবর্ণনীয় কবিতা শোনার প্রতীক্ষায় আছি যা সেক্সপীয়র ওথেলোর মুখ দিয়ে বলিয়েছে।"

"আমি ভাগ্যবান, আমি তাঁকে উনিশশো ত্রিশ সালে স্যাভয় মঞ্চে মূরের (ওথেলো) ভূমিকায় অভিনয় কোরতে দেখেছিলাম। এটা সত্যই অবিস্মরণীয় উপলব্ধি যে তিনি যেভাবে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা কোরে ছিলেন সেক্সপীয়রকে—সেক্সপীয়র সেক্সপই আমাদের জন্যে বর্ণনা কোরতেন। সেক্সপীয়রের নামে ওয়াশিংটনে এই আবেদন জানাই: তাঁরা তাঁকে আমাদের কাছে ছেড়ে দিন।"

এতো বিরাট এক প্রতিভাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে কোনো রাষ্ট্রবিশেষের ক্ষমতা নেই দমিয়ে রাখে। সে-প্রতিভা যে বিশ্বের সম্পদ।

রোবসন কতোগুলি চরিত্রে অভিনয় কোরেছেন

বিশেষ একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে পল রোবসন।

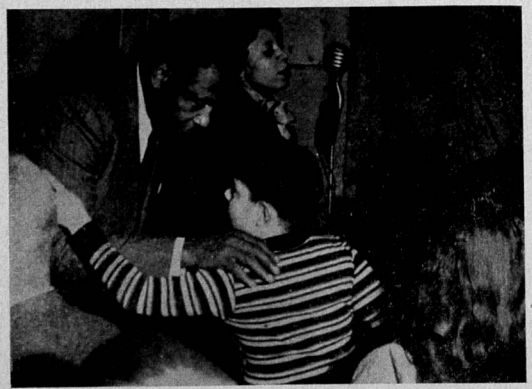

মোটামুটি তার একটা ফিরিস্তি দেওয়া যাক:

নাটক		চরিত্র
চিল্লান গট উইংগ্‌স্	—	জিম হ্যারিস
দি এম্পারার জোন্‌স	—	প্রাক্তন কয়েদী
ব্ল্যাক বয়	—	পুরস্কৃত যোদ্ধা
শো বোট	—	জো
ওথেলো	—	ওথেলো
দি এম্পারার জোন্‌স	—	জোন্‌স
লা ওভারচার	—	তুর্সা (পিটার গডফ্রে কর্তৃক পরিচালিত)

লা ওভারচার তুর্সা

(ছায়াচিত্রে) — তুর্সা (সার্জি আইজেনস্টাইন পরিচালিত)

স্যাণ্ডারস্ অফ দি
রিভার (ছায়াচিত্রে) — বোসাম্বো (জোলটান কোর্ডা পরিচালিত)

এখানে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত সোভিয়েট চিত্র নির্দেশক আইজেন্‌স্টাইন পল রোবসনকে হাইতির মুক্তিদাতা তুর্সার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং শিল্পী সে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেন।

সারা দুনিয়া রোব্‌সনের সৃজনী প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকেই শুধু সমাদর করেননি, বৃহৎ প্রতিভা, বিরাট সৃষ্টিক্ষে সম্মানিত কোরেছে।

যে নিপীড়িত মানবাত্মা রোবসনের মধ্যে সুপ্ত ছিল সেটা আকস্মিক নয়। শিল্পীর শৈশবে এ-ব্যাপারের উদ্ভব। তামাসার ছলে রোবসনের পিতা এক ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি কোরে শোনান যার অর্থ হলো: আমার পুরনো মনিব আমার কাছে এই বোলে প্রতিশ্রুত, যখন তিনি মরবেন তখন আমি মুক্তি পাব। তিনি এতো দীর্ঘ দিন বাঁচলেন, কি বোলব, মাথায় একগোছা চুলও রইল না আর তিনি যে আদৌ মরবেন সে কথাটাও ভুলে গেলেন।

একে ব্যঙ্গ কবিতা বোললে ত্রুটি রয়ে যাবে—এ হোচ্ছে হাস্যরসে জারিত নিপীড়িত মানবাত্মার হৃদয় বিদারক ক্রন্দন।

পল রোব্‌সনের বিরাট ব্যক্তিত্বের ও বিরাট শিল্প-সৃষ্টির উৎস ও প্রেরণা এ থেকেই।

চ ল চ্চি ত্র

জ ল সা ঘ র

অক্টোবর মাসের কোন্ সময়ে আমার মনে নেই য়্যামেরিকা একটি রকেট পাঠায় চন্দ্রলোকের উদ্দেশ্যে ; গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার অনেক আগেই সেটি হাউয়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে যায় ; ফিরে আসে ফের মর্তলোকে। ওই সময়েই অথবা ওর আটচল্লিশ কি বাহাত্তর ঘণ্টা আগে আরও একটি বিস্ময় বাঙলা দেশ থেকে যাত্রা করে যার গন্তব্যস্থল ছিল চন্দ্রলোক, সূর্যলোক সমস্ত লোক পেরিয়ে নিরবধিকাল ধরে বিপুলা পৃথিবী যার দিকে তাকিয়ে আছে সেই চিরকালের রসলোকে। এবং এই বিস্ময়কর বস্তুও পৌঁছতে পারে নি তার উদ্দেশ্যের প্রান্তসীমায়। এই বিস্ময় যাঁর রচনা তার নাম সত্যজিৎ রায় ; বিস্ময়কর সেই বস্তুটির পরিচয় হোলো তারাশঙ্করের জলসাঘর।

য়্যামেরিকার রকেট ফিরে এসেছে, আসুক। সোবিয়েত-রকেট সেখানে পৌঁছে গেছে। এবং পরমানবিক অস্ত্রের অসভ্য আস্ফালনে মানবসভ্যতা যতই যাপন করুক বিনিদ্র রজনী, আমরা যতই বিহ্বল অথবা আতঙ্কগ্রস্ত হই, তাতে কিছুই এসে যাবে না। মানুষ একদিন চাঁদে পৌঁছবে ; সূর্যারতিও একদিন নিজের হাতে প্রদীপ জ্বেলে সম্ভব হবে। চন্দ্রলোক-সূর্যলোকের সমস্ত বিস্ময়ও একদিন বিস্বাদ হয়ে যাবে। শুধু বিস্ময় যার কোনদিন যাবার নয়, তারই নাম রসলোক ; রসলোক নয়, আদিকাল থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত অব্যাহত মানবহৃদয়ের অন্তহীন অতলে চরাচরব্যাপ্ত সেই রহস্যলোক — জীবনের রূপকথাই সেখানে সৃষ্টির অপরূপকথা। বিপুলা এই পৃথ্বীর নিরবধি সেই কালের জ্যোতির্ময়ী তপস্যায় রহস্যলোকের বন্ধদরজা একদিন হঠাৎ খুলে যায়। ভাগ্যবান কোনও পুরুষ প্রবেশপত্র পেয়ে যায় সেই স্বপ্নলোকের। তারপর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে জেগে উঠে সে গানের কথায় কেঁদে ওঠে : জেগে জেগে তাইত ভাবি, কেউ কখনও খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি ?

সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি ! সোনা হয়ে যাবার সোনার মুহূর্তটিকে চিরকালের মত ধরে রাখতে না পেরে যেমন ক্ষ্যাপা খুজে বেড়ায় পরশপাথর, সত্যজিৎ তেমনি হাত্ড়ে বেড়াচ্ছেন এই রসলোকের রহস্যলোকের স্বপ্নলোকের সেই চাবি। . কিন্তু নটরাজের বিরামবিহীন নৃত্যের তালে তালে মহাকাল যেখানে অবিরাম মুখরিত, সৃষ্টির সেই জলসাঘরের চাবি তিনি এবারেও খুঁজে পান নি। এবং পেলে যে আলোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক হোতো, পান নি বলেই তার সমালোচনা সম্ভব হচ্ছে। কারণ লক্ষ্যে পৌঁছানর যে আনন্দ লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার বেদনা তার চেয়ে কম বিস্ময়কর নয় ; নয় এতটুকু কম উল্লেখযোগ্য তাই।

দুই

জলসাঘরে আরেকবার প্রমাণ পেলাম। আরেকবার সেই নির্মম সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী হলাম। আরেকবার জানলাম যে সত্যজিৎ চিত্রভাষা আয়ত্ত করেছেন কিন্তু হৃদয়ের বিচিত্র ভাষা করেন নি করায়ত্ত। করেন নি বলেই জীবনের গল্প বলেনি জলসাঘর। কারণ জীবনের গল্প হৃদয়ের ভাষাতেই বলা যায় শুধু। এবং তারই ফলে জলসাঘর মাত্র দশ হাজার ফিটের ছবি হওয়া সত্ত্বেও ভয়াবহ রকমে বোরিং এবং অগত্যাই মফঃস্বল আবার তার প্রতি বিমুখ হয়েছে। এবং কলকাতার মফঃস্বল যে উত্তর কলকাতা সেও কুণ্ঠিত হয়ে, কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে—একটু বুঝে উঠতে পারে নি তার কি কর্তব্য। না দেখলে যদি কেউ মূঢ় ভাবে সেই ভয়েই কিংকর্তব্যবিমূঢ়রা বৈজয়ন্তীমালার জলসায় যাওয়ার চেয়ে আখ্তারী বাঈয়ের জলসা ঘরে যাওয়া ঢের বেশী রুচিসঙ্গত মনে কোরে মনের ইচ্ছা বাইরে প্রকাশ কোরতে না পারার মনের দুঃখে ডুকরেছে কিন্তু তবু গেছে। অবস্থাটা হয়েছে পরমহংসদেবের বলা সেই গল্পের কীর্তন শুনতে যাওয়া বাবুটির দুরবস্থার চেয়েও বেশী। দুই বন্ধুর একজন গেছে কীর্তন শুনতে, আরেকজন বারনারীগৃহে মাইফেল করতে। কীর্তন শুনতে গেছে যে—শ্রীহরি গুণ-কীর্তন তার কাণে যায়নি এককণাও ; তার বদলে বারবার মনে হয়েছে মাইফেল-উন্মত্ত সেই বুদ্ধিমানের কথাই, বারনারীর বাড়ীতে সে কেমন মজা লুটছে এই ছবিই মনের ছায়াপটে ভেসে উঠেছে, চোখে এসেছে জল। অন্যান্য ভক্তরা ভেবেছে লোকটির কি হরিভক্তি। ভেবে তারাও আবার ভক্তিতে অশ্রুসজল হয়েছে অতঃপর। হতেই হয়েছে ; কারণ তাঁদের মধ্যেও অনেকেরই অকারণ গদগদ হয়ে ওঠার কারণ কোনও ক্ষেত্রে কারণই কেবল আবার কোনও ক্ষেত্রে ওই বন্ধুটির মত যেখানে যাবার জন্যে মন কাঁদছে আসলে সেখানে না গিয়ে হরি-সভায় বসে থাকাই তার আসল কারণ, এরপর আর কোনও কারণ নেই হয়ত অনেক কারুর।

দীপেন্দ্র সান্যাল

তারুণ্যেই যাঁরা উজ্জ্বল রচনা-বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন কো রে ছে ন লেখক তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

জলসাঘর লোকে দেখবার পর নয়, দেখবার আগে সত্যজিৎ ছাড়াও উৎসাহিত হয়েছিল আরও দুটি কারণে একটি হচ্ছে এছবির একক আর্কর্ষণীয় ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অবতরণ। সাধারণ দর্শকদের মানদণ্ডে বাঙলা ছায়াছবির শিশির ভাদুড়ী হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস। জলসাঘর দেখবার পর অবশ্য এ বিশ্বাস আর ছবি যাদের জন্যে চলে সেই দশানার দর্শকদেরও আঁকড়ে থাকা অসম্ভব হবে। আরেকটি উৎসাহের উৎস হল তারাশঙ্করের কাহিনী। বাঙলা দেশের ঘরে-ঘরে একদা-অভিনন্দিত এই কাহিনী যাদের পড়া ছিল, তারা আশা করেছিল সত্যজিৎ সত্ত্বেও জলসাঘরে গল্প একেবারে বাদ হয়ে যাবে না ; নাটকীয় মূহূর্ত বরবাদ হয়ে যাবে না পুরো। এ আশা যে তামাশায় পরিণত হবে, হতে বাধ্য, ছবি আরম্ভ হবার অনেক আগে থেকেই ছবির বিজ্ঞাপন সুরু হওয়া মাত্রই সে সম্বন্ধে অবহিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল বলে আমি মনে করি। ছবির বিজ্ঞাপনে 'জলসাঘর'-এর 'জ' অক্ষরটি যেভাবে উপস্থিত করলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্রী হবার অনেক আগেই যিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনচিত্রী ব'লে, সেই সত্যজিৎ রায়, তাতেই এর আভাস ছিল, 'জলসাঘর' পর্দায় কি হতে যাচ্ছে তারই অপূর্ব পুর্বাভাস। বর্ণ-পরিচয়ের সময় থেকে চির-চেনা 'জ'-অক্ষরটির ওই রকম চেহারা দেখে আমারই অচেনা ঠেকেছে। জলসাঘরের প্রথম বিজ্ঞাপনটিকে বহুসময়ে লসাঘর-লসাঘর পড়বার পর হঠাৎ আমার কাছে একসময়ে প্রথম অক্ষরটি শেষ পর্যন্ত প্রতিভাত হয়েছে বর্গীয় 'জ' বলে।

তিন

সত্যজিৎ শিল্পী, কিন্তু জীবনশিল্পী নন। জীবন-উদাসীন শিল্পী ! আর্ট বলতেই যাঁরা আহ্লাদে আটখানা হয় আজও তিনি তাঁদেরই একজন। আমার এই মন্তব্যের

উৎস তাঁর ছবির জন্যে গল্প নির্বাচনের পদ্ধতি থেকেই উৎসারিত। পর পর তিনি ছবির জন্যে যে সব গল্প বেছেছেন সেগুলিতে সব আছে শুধু হৃদয়ের ভাষায় জীবনের গল্প উচ্চারিত হয় নি কোথাও। তাই তা মহত্তম আর্টের শব হয়েছে মাত্র; জীবনের উৎসব হয়নি কোথাও। তাঁর সাম্প্রতিক চিত্রও জীবনের বিচিত্র কলরব থেকে বহুদূরে থেকে আর্টের জাদু নিয়েই আত্ম-হারা; এবং তারই ফলে জলসাঘর জীবন্ত হয় নি, হয়েছে নির্জীব যাদুঘর। জলসাঘর ছবিতে পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যেই সত্যজিৎ নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। জমিদারের জীবনের ট্র্যাজিডিই জলসাঘরের আত্মা। চিত্রভাষা আয়ত্ত করার আনন্দে এর ছবি যতখানি আত্ম-হারা, জীবনের বিচিত্রভাষা করায়ত্ত না করতে পারার নিরানন্দে ততখানি আত্ম-হারাও বটে। জলসাঘর ছবিতে জমিদারের জন্যে কোথাও করুণা হয় না বরং মনে হয় চিরস্থায়ী প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অচিরেই চিরকালের মত তার স্থায়িত্ব রদ করার প্রচণ্ড প্রয়োজন ছিল। জলসাঘরে ঘরানা বাইজীর বনেদী নৃত্য, ওস্তাদের বাদ্যা-লাপ, হৃতসর্বস্ব জমিদারবাড়ীর হাহাকার, নতুন বড়-লোকের বাড়ী থেকে মোটরের ভেসে আসা শব্দে 'মুহূর্তের তালভঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের রোষ' সব উপস্থিত। শুধু উপস্থিত নয়, অসাধারণ শিল্পদক্ষতায় উপস্থিত; উপস্থিত বাঙলায় সত্যজিৎ ছাড়া আর কারুর পক্ষে তা সম্ভব হোতো মনে করি না। কিন্তু এসত্ত্বেও কি জমিদার তার জীবনের দুরন্ত ট্র্যাজেডী নিয়ে জলসাঘর ছবিতে আগাগোড়া অনুপস্থিত নয়?

কেন অনুপস্থিত এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই জবাব আছে কেন সত্যজিতের ছবি জনপ্রিয় না হয়ে বরাবরই কেবল বিদ্বজ্জন-প্রিয় হচ্ছে। এইখানেই বিশ্বচিত্রী সত্যজিতের সবচেয়ে বড় গুণ এবং সবচেয়ে বড় দোষ মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন বড়লোকের বাড়ী একবারও না দেখিয়ে শুধু শব্দের মধ্যে দিয়ে ইঙ্গিতে তার অশালীন-তাকে বোঝাতে গিয়ে শিল্প যে পরিমাণে সার্থক হয়েছে, 'জীবন' হয়েছে ঠিক সেই পরিমাণে অবহেলিত। অপরাজিত-য় লীলা-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে, পরশ পাথরে হিন্দোলকে একবার না দেখিয়ে এবং এখন জলসাঘরে নতুন বড়লোকের বাড়ীকে নেপথ্যে রেখে অতিনাটকীয়তা দোষ থেকে মুক্ত থাকবার প্রচেষ্টায় নাটকের গুণও ঢোকবার পথ পায়নি ছবিতে। রবীন্দ্রনাথ যে কণিকা-র একটি ছোট কবিতায় বলেছেন যে মিথ্যার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে জীবনের সমস্ত বাতায়ন রুদ্ধ করে যে ঘরে খিল এঁটে বসে আছে তার কাছে সত্য তাহলে কোথা দিয়ে প্রবেশ করবে—এ কেবল কবির কূট নয়; এ হচ্ছে জীবনেরই নির্মম জিজ্ঞাসা।

আমার বক্তব্যের যুক্তি প্রণিধানযোগ্য হবে যদি এখানে এখনই মূল কাহিনীকে ছবির কাহিনীর পাশাপাশি এনে দাঁড় করাতে পারি, তবেই। মূল গল্পও আমার কাছে অনিন্দ্য ছোট গল্প নয়। বরং জলসাঘরকে উঁচু-দরের ন্যারেটিভ বলাই সঙ্গত। সার্থক ছোটগল্পের সংস্থা হচ্ছে যার আরম্ভ, অগ্রগতি ও সমাপ্তি আছে। ঘটনার অগ্রগতি অথবা চরিত্রের বিকাশ দুয়ের যে কোনটিও সমান গ্রাহ্য। কিন্তু কোনও সময়েই তা কেবল বর্ণনায় পর্যবসিত হবে না। সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তা সমাপ্তির দিকে এগুবে। জলসাঘর এই কারণেই বর্ণনাত্মক; জলসাঘরে লেখক বলে গেছেন এরপর এই হোলো, তারপর তাই হোলো, এইভাবে। প্রধান চরিত্রের উত্থান-পতন স্বতোৎসারিত নয়। তবুও 'জলসাঘর' পড়তে-পড়তে চোখের কোণ চিকচিক করে। মহীরুহের সুনিশ্চিত পতন আসন্ন হবার মুহূর্তে জমিদারের জন্যে অব্যক্ত বেদনায় বিদীর্ণ হয় শুষ্কতম হৃদয়ও। জলসাঘর যেখানে শেষ সেখানে শেষ নয়,—পাঠকের মনে তখনও তার রেশ ফুরোয় না। এইখানেই জলসাঘর—লেখকের জয়।

ছবিতে অতিনাটকীয় না হতে গিয়ে জলসাঘর যা হয়েছে তা সার্থক ড্রামার পরিবর্তে অসার্থক, অনর্থক ডকুমেণ্টারী। পথের পাঁচালী অথবা অপরাজিত হিউমেন ডকুমেণ্টারী হলে যা' হয় জলসাঘর হিউম্যান ড্রামা না হলে তা কিছুতেই হয় না। পথের পাঁচালী বা অপরা-জিত-র কাহিনীই খানিকটা ডকুমেণ্টারী-ধর্মীয়। জলসাঘর-গল্পের চরিত্রই অন্য জাতের। সত্যজিৎ যেখানে সার্থক সেখানে ডকুমেণ্টারী হচ্ছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র। কিন্তু গল্প থাকলেই তিনি এযাবৎকাল ছবিতে তাকে এড়াতে

চেয়েছেন। জীবনের গল্প না বললে ছায়াচিত্রের আবি-র্ভাব হোতো অনাবশ্যক। ছায়াচিত্রও গল্প বলবার অন্যতম মাধ্যম। পাথরের গায়ে মানুষ যা একদিন উৎকীর্ণ কোরে রাখতে চেয়েছিল, আকাশের নীচে আগুনের চারপাশে গোল হোয়ে বোসে যা শুনতে চেয়েছিল, তালপাতার পুঁথিতে, ছাপার অক্ষরে যাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল, আজ যাকে সে চিত্রভাষার বিচিত্র আঙ্গিকে বলবার কায়দা করায়ত্ত করেছে সব যুগেই তার পরিচয় এক; সে হচ্ছে মানুষের জীবনের গল্প। এই গল্পের অনুপস্থিতিতে প্রাণের অভাব সূচিত হয়। তখন প্রাণের প্রতিমা পর্যবসিত হয় মাটির পুতুলে।

আমি জানি। আমি জানি যে গল্প বললে শুধু পঞ্চতন্ত্রের গল্প বোঝায় না। গল্পের সংস্থাই আজ বদলে গেছে। যাক। কিন্তু আমি যে সেই সঙ্গে এ-ও জানি যে পঞ্চতন্ত্রের যুগ থেকে প্রজাতন্ত্রের হুজুগ পর্যন্ত সে জিনিসের অর্থ পালটেছে কিন্তু মূল্য পালটায় নি তার নামই গল্প। গল্প বলতেই হবে; জীবনের গল্প হৃদয়ের ভাষায়। শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়; জীবনগ্রাহ্যও বটে। এছাড়া আরও যা আমি জেনেছি তা হচ্ছে শিল্প শুধু বিদ্বজ্জনপ্রিয় হলেই চলবে না, জনপ্রিয়ও হোতে হ'বে তাকে। নইলে তা কলেজ পাঠ্য অথবা অপাঠ্যরিসার্চ হতে পারে কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটক হতে পারে না; হতে পারে না চার্লি চ্যাপ্‌লিনের ছবি।

তারাশঙ্করের জলসাঘরে যে জমিদারের চেহারা সত্য-জিতের জলসাঘরে তার প্যারডি মাত্র উপস্থিত। ছবিতে ছাদের ওপরে গড়গড়ার নল হাতে যাকে দেখি তাকে দেখে হেড অফিসের বড় বাবু মনে হয়। খেতে না পাওয়া বোহেমিয়ান অর্থাৎ বাপে খেদান মায়ে তাড়ান কিম্ভুট বাবু মনেহয় কিন্তু একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুর্বর্ষ কোনও চরিত্রের বাষ্পমাত্রও বোধ হয় না। সমস্ত ছবিটি ওই আরম্ভ থেকেই এমন শ্লথগতি নেয় যে ছবিটির কোনও জায়গায় একটু জোরে হাঁটে না পর্যন্ত। বৃহদারণ্যে বনস্পতির আসন্ন মৃত্যুতে যে মহৎ বিষণ্ণতা মানুষের অন্তঃস্থল পর্যন্ত স্পর্শ করে এ ছবির কোথাও জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের চিত্ররূপে তা কণামাত্রও বিশ্বাসযোগ্য নয়। জমিদারের বহির্বাসও যে জমিদারের ছবি জলসাঘরে তারাশঙ্কর এঁকেছেন তাঁর বহির্বাস নয়। ঠাকুর পরিবারের জোব্বা পরিয়ে জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের জাত মেরেছেন সত্যজিৎ রায়। এমন কি ভৃত্য যেভাবে সরবৎ এনে দিয়েছে এবং গেছে তা এতদূর অবাস্তব এবং অনভিজ্ঞ যে সত্যজিৎ সম্বন্ধে সত্য সত্যই সন্দেহ হয় যে তিনি জলসাঘর বলতে আজকাল পাড়ায় বেপাড়ায় পূজা উপলক্ষে অথবা কোন উপলক্ষ ছাড়াই যে অগুন্তি জলসা হয় তাই বোঝেন নি ত?

কিন্তু জলসাঘর ছবিতে আগাগোড়া যদি স্বধর্ম রক্ষা করতেন সত্যজিৎ তাহলে তাঁর ছবি যা হয়েছে তা হতে পারত না। পুরোপুরি নিজের পথে এগুতে ভয় পাবার ফলেই ভয়াবহ হয়েছে পরধর্ম। ড্রামাটিক না হবার মৃত্যুপণ তাঁর, তাতেই তাঁর ছবি ডকুমেণ্টারী হয় সাধারণতঃ;—এ ছবিতে বহু জায়গায় ড্রামাটিক না হবার চেষ্টা যেমন প্রকট, একটি জায়গায় মেলোড্রামাটিক হবার অপচেষ্টা তেমনই বিকট। ঝড়ের পর মরা ছেলের দৃশ্যটি কিসের কারণে অমন বিভৎস ভাবে উপস্থিত কে জানে। এছাড়া ছবির প্রায় শেষ দৃশ্যে ছবির নায়কের মুখ দিয়ে যখন রক্ত বেরুচ্ছে তখন চাকরের মুখ দিয়ে 'রক্ত'—কথাটা বলানোর পর বিশ্বম্ভর রায়ের মৃত্যু হল না শুধু, ওই সঙ্গে শিল্পাত্মার অপমৃত্যু হল শিল্পীশ্রেষ্ঠর নির্দয় হাতে। নিজের হাতে নিজের সন্তানকে গলা টিপে হত্যার এমন ঘটনা সৃষ্টির ইতিহাসে সত্যই বিরল। এ-রসাভাস দেবকীকুমার বসু বা নরেশচন্দ্র মিত্র, সুশীল মজুমদার অথবা বেণু লাহিড়ী, তপন সিংহ বা বংশী আস জ্যোতির্ময় রায় কি চিত্ত বসু, প্রভাত মুখার্জি কিংবা হরিদাস ভট্টাচার্য এবং অসিত সেন অথবা যে কেউ, ঘটালে বলবার ছিল না কিছু; বরং না ঘটালেই অবাক হবার, হতবাক হবার ফলে না বলবার ছিল অনেক কিছু।

এ-ছবির নায়কের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদিও বিশ্বম্ভর রায় ছাড়া ছবিতে আর কারুর চরিত্রের তেমন গুরুত্ব নেই, তবু ছবিবাবু ছাড়া আর প্রায় সবাই এছবিতে ভালো অভিনয় করেছেন। ছবি বিশ্বাস যে আসলে কত সাধারণ শিল্পী জলসাঘর তার প্রমাণ হয়ে রইল। তুলসী লাহিড়ীর নীরব উপস্থিতি এছবিতে যত উজ্জ্বল ছবি বিশ্বাসের মুখের ওপর সারাক্ষণ

ক্যামেরা রেখে দেওয়ার পরও তা তেমন উজ্জ্বল নয়। এমন কি পদ্মা সেখানে বলেছে ছুটুমি কোরো না,—সেখানেও ছবি বিশ্বাস তুড়ির মুখেই উড়ে গেছেন অনেক দূরে।

জলসাঘরের আলোকচিত্র বিচিত্র কিন্তু বিশিষ্ট নয়। বিশিষ্ট না হবার কারণ আর কিছু নয়, কায়দা দেখাবার বাড়াবাড়ি মাত্র। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে। জলসাঘরের দৃশ্যটি দুটি থামের মাঝখান দিয়ে দিয়ে দেখানোর মধ্যে দৃশ্যকে উজ্জ্বল করে তোলার চেয়েও যা প্রকট তা হল দেখ কেমন ক্যামেরার কাজ শিখেছি,—এই বাহাদুরীই। স্টাইল যেমন বক্তব্যের চেয়ে লাউড হলে সাহিত্যের ব্যাকরণানুযায়ী তা কিছুতেই এলাউড নয় তেমনি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ক্যামেরা সাবজেক্টের চেয়ে বড় হয়ে গেলে তা অবজেকশানেবল্। সেই হচ্ছে স্টাইল যার অনুপস্থিতিই বুঝিয়ে দেবে যে সে উপস্থিত। ভদ্রলোকের পোষাক হচ্ছে তা-ই যা কোথাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না জোর করে। ক্যামেরার জন্যে ছবি করা হয় না। ছবি করার জন্যেই ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রোশনকুমারীর নাচের দৃশ্যটি অতক্ষণ ধরে দেখাবার কারণ কি? এদেখে আমার প্রায়ই মনে হচ্ছে এখন সত্যজিৎ কোথায় আরম্ভ করতে হয় তা জানলেও কোথায় থামতে হয় তা এখনও জানেন না। জলসাঘরের আবহসঙ্গীত স্বকর্ণে প্রত্যক্ষ করবার পর অতঃপর যে বিশ্বাস আমার সম্প্রতি দৃঢ়মূল হয়েছে তা হচ্ছে আবহসঙ্গীত সব সময়ই ছবির পক্ষে অপরিহার্য নয়; কখনও কখনও তা রীতিমত অপ্রয়োজনীয়। বর্জনীয় বললে ক্লাস শোনাবে বলে মোলায়েম করে বলছি অপ্রয়োজনীয়।

সব শেষে এখন যে কথা বলছি সব আগে সেই কথাই বলা উচিত ছিল। সব চেয়ে আগে আমার বলার ছিল যে সত্যজিৎ সম্পর্কে সত্য কথা বলার সময় এখনও হয়েছে কি না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরাজিত আজকের বাঙালীকে অপরাজিত-র সন্মান এনে দিয়েছেন সত্যজিৎ। তাঁর জয় বাঙালীরই দিগ্বিজয়ের ইতিহাস। তবুও যে অপ্রিয় সত্যভাষণ করেছি সত্যজিৎ সম্পর্কে তার কারণ সত্যজিতের ভয় অপ্রিয় সত্যভাষণ থেকে নয়; তাঁর আসল ভয় প্রিয় অসত্যভাষণ থেকেই জাত হবে। এক সময়ে ছবির পরিবেশক খুঁজে পান নি তিনি; আজ তাঁর ছবির নাম ঘোষণা মাত্র চলচ্চিত্র জগতের সমস্ত প্রান্তে সাড়া জাগে। তাই তাঁর ছবির সমালোচনা হয় না,—স্তাবকতা করা হয় তাঁর সর্বত্র। এক সত্যজিৎ যিনি বাঙলা ছবির শেষ ভরসা বলেই আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাঁর চিত্রের যথার্থ আলোচনা।

মিজারেবল হয়েছিল পরশপাথর। হোক্। বোঝা গিয়েছিল সত্যজিৎ প্রতিভা। কারণ প্রতিভা যখন কিছু মিস্ করে তখন সে একেবারে তলায়। মাঝামাঝি ভাসায় না। কিন্তু জলসাঘর মিজারেবল না হয়ে যে মিডিওকার হয়েছে এতেই যতেক আশঙ্কা। অপরাজিত-য় যে প্রতিভার পরশ পাথর তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তা তিনি গলাধঃকরণ করে ফেলেছেন কি না জলসাঘর দেখে এমন আশঙ্কা অসঙ্গত নয়। তবু আশা করি তাঁর পরবর্তী কোনো ছবি সে আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করবে এবং তা করলে আমার চেয়ে সুখী সম্ভবতঃ তিনিও হবেন না।

খবরাখবর

বর্তমান বছরের বারোই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় শিল্পীদের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। কেননা প্লাষ্টিক আর্টের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব টি. লিসের নয়াদিল্লীর জয়পুর হাউসে ভারতীয় শিল্পীদের সমক্ষে তাঁর সুনিশ্চিত ভাষণ দেন: 'প্লাষ্টিক আর্ট সম্বন্ধে এ-দেশে পরিমিত চর্চা হোয়েছে বোললেও অত্যুক্তি হয়।' এহেন খ্যাতনামা ব্যক্তির মন্তব্য ভারতীয় শিল্পীদের পক্ষে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কিছুদিন আগে নয়াদিল্লীতে ইয়োগোস্লাভ গ্রাফিক আর্ট এবং উড এন্‌গ্রেভিং-এর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মতো ইয়োগোস্লাভের শিল্প-ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ। নয়াদিল্লীর রসজ্ঞ দর্শকরা স্বভাবতই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী এ, কে, চন্দ।

। নয়াদিল্লীস্থ ললিত কলা আকাদেমী ভবনে ইণ্টারন্যাশনাল এ্যাসোশিয়েশান অব প্লাষ্টিক আর্ট-এর বক্তৃতারত ভাইস প্রেসিডেন্ট টি, লিসের।

গত আঠাশে মাচ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বিধান-সভায় রবীন্দ্র নাট্য-সঙ্গীত-নৃত্য বিশ্ব-বিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, নিঃসন্দেহেই তা সংস্কৃতি-জগতের বিশিষ্টতম খবরের অন্যতম। ১৯৬১ সালে কবিগুরুর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জোড়া-সাঁকোর সবগুলি অংশ ক্রয় কোরে সেখানে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করবেন বলে খবরে প্রকাশ। কবি-গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এইটিই প্রকৃত পন্থা বোলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন।

বলাই বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রশংসাযোগ্য পরিকল্পনার খবরে শিল্পী ও শিল্পরসিক ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হবেন। এজন্য আমরা সরকারকে অজস্র সাধু-বাদ জানাচ্ছি।

একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর নিজস্ব ভবন নির্মাণের সঠিক ঘোষণা শুনে মনে হয় বুঝিবা অবশেষে শিল্পীদের বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হোতে চল্‌ল। বাংলা-দেশের শিল্প ও শিল্পীদের জন্য শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে যে সাহায্য ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে এসেছেন, একাডেমির ভবন নির্মাণ পরিকল্পনায় তার বাস্তব প্রমাণ মূর্ত হোতে চলেছে। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও কর্মতৎপরতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা কোনদিন জন্ম নিত কিনা সন্দেহ। এজন্য তিনি বাংলাদেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকগণের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে থাকবেন।

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী-ইউনিট কলকাতায় আর্টিষ্ট হাউসে ভারতীয় শাড়ির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। বারাণসী, চান্দেরী, মাহেশ্বরী, কাশ্মীরী, শান্তিপুরী, ঢাকাই, জামদানী, বালুচরী প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বহুবিচিত্র শাড়ির সমাবেশে এই প্রদর্শনী বিশেষ মনোরঞ্জক হয়েছিল। শ্রীমতী রাণু মুখার্জি এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন।

এই ধরণের একটি প্রদর্শনীর আয়োজনের জন্য নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা প্রশংসার পাত্র। মাঝে-মধ্যে তাঁরা যদি এবম্প্রকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন, তাতে শুধু শিল্পোৎসাহীরাই লাভবান হবেন, তা নয়, পরন্তু তাতে দেশজ শিল্পের প্রসায় বহুলাংশে বর্ধিত হবে। যে-সব দেশজ শিল্প, বিশেষত প্রাচীন শিল্প, আজ মৃতপ্রায় প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের জনপ্রিয় ও পুনরুজ্জীবিত করে তোলা নিখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ডের মতো সংস্থা-সমূহের প্রধান দায়িত্ব। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে যে-সব হস্তশিল্পী ও অন্যান্য দেশীয় কারিগর স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের জিনিসের চাহিদা ও বিক্রয় বাড়লে অতঃপর তাঁদের প্রতিভা অপমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে। সুখের বিষয়, এই ধরনের মহৎ দায়িত্ব ও আশু কর্তব্য সম্বন্ধে নিখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ডের সচেতনতা ও কর্মকৃতি সবিশেষ প্রশংসনীয়। আর্টিষ্ট হাউসে অনুষ্ঠিত তাঁদের এই শাড়ি প্রদর্শনী ইতিপূর্বে শ্রীনগর, অমৃতসর, বোম্বাই, মাদুরা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ কোরে এসেছে।

বাঙালী লেখকদের কাঙ্ক্ষিতব্য লেখক-সম্মেলনগৃহ বা 'রাইটার্স ক্লাবের' দ্বারোদ্‌ঘাটন শীঘ্রই হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এবং একদিন মহাসমারোহে—যে সমারোহে লেখক বন্ধু হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুও হয়তো উপস্থিত থাকবেন—এই দ্বারোদ্‌ঘাটন-কার্য সুসম্পন্ন হবে, লেখকরাও একদিন হয়তো আনন্দে-উল্লাসে সম্মেলন-গৃহে অজস্র প্রহর ব্যয় করবেন। তবু সেদিন, আর যাই হোক, বাঙালী শিল্পীদের পক্ষে পুরোপুরিভাবে আনন্দের দিন নয়, কারণ এই সম্মেলন-গৃহ শিল্পীশ্রেণীর একটি অংশের মাত্র, সকলের নয়; এই সম্মেলন-গৃহে শুধুমাত্র লেখকদেরই প্রবেশাধিকার, চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর সেখানে অবাঞ্ছিত। শিল্প কথাটির ব্যঞ্জনা দুরপ্রসারী, প্রাচীন শাস্ত্রকাররা শিল্পীকে ঋষিতুল্য জ্ঞান করেছেন, কিন্তু ক্লাব বা সম্মেলন-গৃহ করার সময় সেই কথাটি চমৎকার ভাবে ভুলে ক্লাবের কর্তারা 'ঋষি' কথাটায় যে নূতন ব্যঞ্জনা আরোপ করেছেন, তাতে তাঁদের তারিফ না করে উপায় নেই। আমরা আশা করেছিলাম, দাবিও

জানিয়েছিলাম, এই ক্লাবটি রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিষ্টস ক্লাব নামে পরিচিত হোক এবং লেখকদের সঙ্গে চিত্রশিল্পী বা ভাস্করদেরও নেওয়া হোক। আমাদের সে দাবি ক্লাবের তথাকথিত লেখক ও উপলেখকদের সাময়িক-বধির কানে পৌঁছায় নি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই ক্লাব 'রাইটার্স ক্লাব' নামেই পরিচিত হচ্ছে। যে বাঙালী রাইটার্স বা রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে চেয়ে কলম পেষেণ, সে কালে সে দেশে এ ধরনের ব্যাপার অপ্রত্যাশিত নয়।

প্রকৃতির সঙ্গে বাস্তবে, একটু অন্যভাবে গীতলতার সঙ্গে বাস্তবতার, সার্থক সমন্বয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'মাহুত বন্ধুরে' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষারত। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চিহ্নিত হবার যোগ্য এই ছবিটির পরিচালক ডক্টর ভূপেন হাজারিকা সংগীত শিল্পী ও সুরকার হিসাবে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে আসামী ভাষায় 'এরা বাটুর সুর' নামে একটি ছবি তৈরি করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলাভাষায় এটি তাঁর প্রথম ছবি। স্বর্গীয় প্রথমেশ বড়ুয়ার পুত্র শ্রীঅলকেশ বড়ুয়ার কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'মাহুত বন্ধু রে' ছবির সংগীত-পরিচালকও ডক্টর হাজারিকা স্বয়ং। এখানে উল্লেখ্য ছবিটির অধি-কাংশ গান আসাম ও বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের মাহুতরা গেয়েছে; কয়েকটি লোক-সংগীত পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী প্রতিমা বড়ুয়া এবং 'সুন্দরম্'-এর অন্যতম লেখক কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত রচিত একটি ব্যঙ্গ-গীতি গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শুধু লোক-গীতি নয়, রাগরূপ, বিহ প্রভৃতি বাংলা ও আসামের বিভিন্ন লোকনৃত্যও এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। 'মাহুত বন্ধুরে'-র অভিনয়াংশে আছেন দিলীপ রায়, প্রকৃতীশ বড়ুয়া, জহর রায়, মানসী সোম, নবাগতা তৃষ্ণা প্রভৃতি এবং মাহুতের দল। আলোকচিত্রণ ও শব্দানুলেখনে আছেন যথাক্রমে শ্রীঅজয় মিত্র ও শ্রীঅবনী চট্টোপাধ্যায়। লোকগীতি ও লোকনৃত্যের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ 'মাহুত বন্ধু রে', বলতে গেলে, সম্পূর্ণতঃই, স্টুডিয়োর কৃত্রিমতাকে পরিহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধুর্যে ও যথাযথ্য-তোলা। নূতন বিষয়বস্তু অবলম্বনে নির্মিত এই শিল্পকর্ম আশা করি শিল্পরসিকদের কাছ থেকে যোগ্য সমাদর পাবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে চীনা শিল্পীদের দেখা যাচ্ছে।

প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও মার্কাস স্কোয়ারে

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ইয়োগোস্লাভ গ্রাফিক আর্ট এবং উড্ এনগ্রেভিং-এর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রী এ. কে চন্দ। ছবিতে তাঁকে এবং ইয়োগোস্লাভীয় দূত (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়) ডুভান ভেচারকে শ্রীযুক্ত বরদা উকিল সহ দেখা যাচ্ছে।

পনেরো দিন ধরে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হয়ে গেল। এবং অন্যান্য বছরের মতো এবারেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকশিল্পীরা এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শুধু গ্রাম-অঞ্চলের লোকশিল্পীরাই নন, কলকাতা শহরের বহু শিল্পীও এতে সংগীত নাটক প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের শেষ পর্বে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ একটি সাহিত্য সভায় মিলিত হোয়ে সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রতি বছর এ ধরণের সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে তাঁদের কাছে একটি নিবেদন এই, বঙ্গ সংস্কৃতির স্রোতোধারাকে বহমান রাখতে হোলে, শুধুমাত্র শহর কলকাতার বুকে কয়েকদিন ধরে সাংস্কৃতিক সম্মেলন করলেই চলবে না, বাংলাদেশের গ্রামে গিয়ে গ্রাম-শিল্পীদের মধ্যেও সাহায্য দানে তাঁদের প্রশংসার্হ কর্মশক্তিকে নিয়োগ করার প্রয়োজন আছে।

কিছুদিন আগে কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে 'সাঁঝ-সবেরা' নামে একটি নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়েছিল। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শচীনশঙ্করের নেতৃত্বে বম্বের ব্যালে ইউনিট এই নৃত্যনাট্য রূপায়িত করেছিলেন।

ভারতীয় কৃষক-জীবন অবলম্বনে রচিত নরেন্দ্র শর্মার একটি কাহিনী এই নৃত্যনাট্যের ভিত্তিভূমি। নৃত্য-প্রকল্পনা সুরযোজনা ও আলোকসম্পাতে ছিলেন যথাক্রমে শচীনশঙ্কর স্বয়ং, অনিল বিশ্বাস এবং শুভেন্দু রায়। ভারতের সভ্যতা যে মূলত কৃষিকেন্দ্রিক, কৃষকরাই যে ভারতের শক্তি ও সমৃদ্ধির যথার্থ উৎস—এই বক্তব্যটি শচীনশঙ্কর বিভিন্ন ভারতীয় নৃত্যধারার সংমিশ্রণে এবং প্রধানত বিভিন্ন পল্লিনৃত্যের মাধ্যমে চমৎকারভাবে রূপায়িত করে তুলেছিলেন। অনিল বিশ্বাসের সুর-সৃষ্টি এবং শুভেন্দু রায়ের পরিবেশানুগ আলোক-সম্পাত এবং সর্বোপরি অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় 'সাঁঝ-সবেরা' শিল্পরসিকদের বিমুগ্ধ প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। ইতিপূর্বে এই ব্যালে ইউনিট কর্তৃক পরিবেশিত 'ফিশার ম্যান অ্যাণ্ড দি মারমেড' ও 'রামায়ণ' নামক পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য-দুটিও প্রশংসিত হয়েছিল।

সম্প্রতি কলকাতার আর্টিস্ট্ হাউসে শ্রীমতী শ্যামা চৌধুরীর একটি চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীমতী

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকেশকার সহ শিল্পী জ্যোতিষ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চৌধুরীর জন্ম এবং শিল্প শিক্ষা লণ্ডনে। প্যারিসেও তিনি কিছুদিন শিল্প শিক্ষা করেছিলেন। বছর দুই আগে তিনি ভারতে এসেছেন। সুতরাং তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী নিঃসন্দেহেই চিত্রপ্রিয়দের উৎসাহের কারণ হোয়েছে।

মাত্র বত্রিশটি ছবির সমবায়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে বেশ কয়েকটি ছবিই সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। পাশ্চাত্য শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষার ফলে তাঁর ছবিতে পাশ্চাত্য সুলভ চিত্ররীতি ও চিত্রশৈলীর প্রভাব এবং বিদেশী আবহাওয়া থাকলেও ভারতীয় পরিবেশ যে একেবারে অনুপস্থিত, তা নয়। এবং এই ভারতীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সাহসী ও বলিষ্ঠ রেখায়, রঙের বিচিত্র ও সার্থক ব্যবহারে, গভীরতা ও ঘনত্ব সৃষ্টিতে, অ্যাসিমেট্রির মধ্যে সিমেট্রি আনয়নে শ্রীমতী চৌধুরী বিশেষ দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সম্প্রতি তরুণ শিল্পী জ্যোতিষ ভট্টাচার্যের প্রদর্শনী নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হোয়েছে। 'অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস সোসাইটি'র হলে এই প্রদর্শনী হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর বি, ভি, কেশকার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। আনন্দের কথা, তরুণ শিল্পীর দক্ষতা দর্শক ও সমালোচক উভয়কেই মুগ্ধ করে।

বছরের গোড়ার দিকে ভারত সরকারের আমন্ত্রণ ক্রমে চীনা শিল্পীদের প্রতিনিধি-মূলক একটি দল ভারত ভ্রমণে আসেন। বলা বাহুল্য, এধরণের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধির বিনিময়ে দুই দেশের আন্তিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় কোরে তুলতে সাহায্য করে। শোনা যাচ্ছে আমাদের কৃষ্টি মন্ত্রী প্রোফেসর হুমায়ুন কবির চীন ভ্রমণে আমন্ত্রিত হোয়েছেন।

মাস কয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গ 'লোক-প্রমোদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোক প্রমোদ বিভাগের প্রযোজনায় 'গঙ্গাবতরণ' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য।

বিভাগে'র প্রযোজনায় রাজধানীতে' গঙ্গাবতরণ' নামে একটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হোয়েছিল। শিল্পীদের নৈপুণ্যে এবং কাহিনীর সহজাত আবেদনে দর্শকমণ্ডলী খুবই আনন্দিত হোয়েছিলেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র (সংগীত ও নাটক বিভাগ) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এই অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। লোক-প্রমোদ বিভাগ এব্যাপারে আমাদের ধন্যবাদ জানান।

। 'মাহুত বন্ধুরে' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে হাতির পিঠে শ্রীযুক্ত প্রকৃতীশ বড়ুয়া।

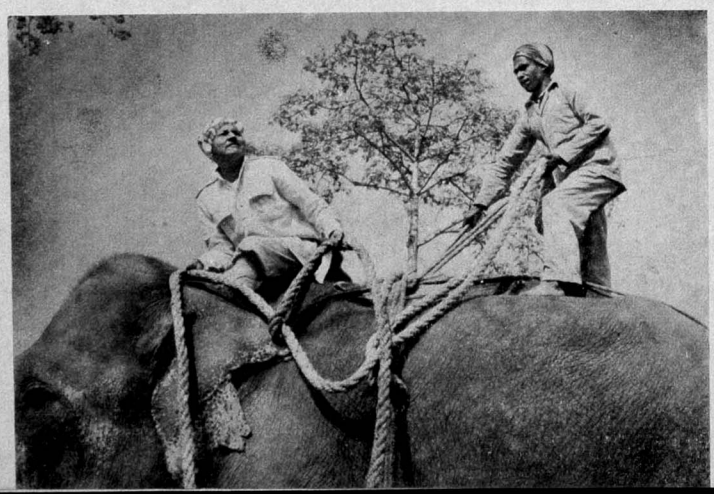

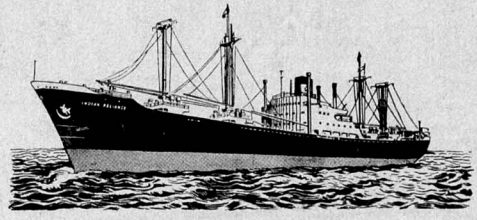

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোং লিঃ

ভারত-যুক্তরাজ্য-কণ্টিনেণ্ট সার্ভিস

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকুল বন্দরেও যাতায়াত করে

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১

ফোন ঃ ২৩-১১৭১ (৮টি লাইন)

হস্তচালিত তাঁত শিল্প প্রতিযোগিতা

পুরস্কার বিতরণের বিস্তৃত বিবরণ

১৯৫৮–৫৯

পশ্চিমবঙ্গে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এই শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীদিগকে গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও একটি প্রতিযোগিতায় আহ্বান করা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-অধিকার (ডাইরেক্টরেট অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ) উক্ত প্রতিযোগিতায় নিম্নোক্ত বিভিন্ন বিভাগে যাঁহারা উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন, তাঁহাদিগকে নগদ টাকা পুরস্কার দিবেন।

ক। তাঁতে-বোনা সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়ের জন্য বিভিন্ন জেলায় মোট পুরস্কার ৯৫০৲ এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় তিন জনের জন্য অতিরিক্ত মোট পুরস্কার ৩০০৲ টাকা। খ। তাঁতে-বোনা কাপড়ে সর্বোৎকৃষ্ট ছাপানর জন্য বিভিন্ন জেলায় মোট পুরস্কার ৬০০৲ টাকা এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুইজনের জন্য অতিরিক্ত মোট পুরস্কার ১৫০৲ টাকা। গ। তাঁতে-বোনা ও ছাপানো কাপড়ে ব্যবহারার্থ কাগজে আঁকা নক্সার জন্য কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট পুরস্কার ৩৮৫৲ টাকা এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুইজনের জন্য অতিরিক্ত মোট পুরস্কার ১১৫৲ টাকা। ঘ। সর্বাপেক্ষা মিহি সুতার সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়ের জন্য হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভুম, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় মোট পুরস্কার ১,২০০৲ টাকা এবং জেলা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদিগের শীর্ষস্থানীয় তিনজনের জন্য অতিরিক্ত মোট পুরস্কার ৩০০৲ টাকা। ঙ। তাঁতে-বোনা আধুনিক রুচিসম্মত নানাপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় কাপড়ের জন্য বিভিন্ন জেলায় দেয় মোট পুরস্কার ৮২০৲ টাকা এবং জেলা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় তিনজনের জন্য অতিরিক্ত মোট পুরস্কার ১৮০৲ টাকা

প্রতিযোগীতায় যোগদানেচ্ছু শিল্পীগণ তাঁহাদের দ্রব্যাদি ১৯৫৮ সালের ৩০এ ডিসেম্বরের পূর্বে স্ব স্ব জেলার সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী নিয়ামক (অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার) মহাশয়ের অফিসে দাখিল করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-অধিকার কর্তৃক মনোনীত বিচারকগণের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। একজন প্রতিযোগী একাধিক বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত দ্রব্যাদি ফেরৎ দেওয়া হইবেনা; অবশ্য যাঁহারা পুরস্কার পাইবার যোগ্য বিবেচিত না হইবেন তাঁহাদের জিনিষগুলি ফেরৎ দেওয়া হইবে। বিচারকগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরস্কৃত জিনিষগুলির মূল্যও স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হইবে; কেবলমাত্র কাগজে আঁকা নক্সার জন্য কোনও মূল্য দেওয়া হইবে না।

রাজ্যের সাধারণ প্রতিযোগিতা—

১। হাতে-বোনা সর্বোৎকৃষ্ট জমির কাপড়ের জন্য জেলা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় তিনজনের মোট পুরস্কার ৩০০৲ টাকা। ২। তাঁতে-বোনা কাপড়ে সর্বোৎকৃষ্ট ছাপানোর জন্য জেলা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুইজনের মোট পুরস্কার ১৫০৲ টাকা। ৩। তাঁতে-বোনা ও ছাপানো তাঁতের কাপড়ে ব্যবহারার্থ কাগজে আঁকা নক্সার জন্য জেলাসমূহের পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুইজনের মোট পুরস্কার ১১৫৲ টাকা। ৪। সর্বাপেক্ষা মিহি সুতায় সর্বোৎকৃষ্ট জমির কাপড়ের জন্য জেলাসমূহের প্রতিযোগীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় তিনজনের মোট পুরস্কার ৩০০৲ টাকা। ৫। তাঁতে-বোনা আধুনিক রুচিসম্মত নানাপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় কাপড়ের জন্য জেলা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় তিনজনের মোট পুরস্কার ১৮০৲ টাকা। রাজ্যের সাধারণ মোট পুরস্কার ১,০৪৫৲ টাকা এবং জেলার মোট পুরস্কার ৩,৯৫৫৲ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৫,০০০৲ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক : সুভো ঠাকুর। ১৪৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা। মুদ্রণ : দি আর্ট সেন্টার প্রাঃ লিঃ, ৭ ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলকাতা

বাংলার কারুশিল্প

বাংলার কারুশিল্প চারুকলার অপূর্ব নিদর্শন। ন্যায়সঙ্গত দর ব'লে তার কদরও হওয়া উচিত ঘরে ঘরে। এসব জিনিষ শুধু যে সংগ্রহশালার গৌরব বৃদ্ধি করে তা নয়, গৃহের সৌন্দর্য ও সকলের আনন্দ বর্ধনেও এর তুলনা নেই।

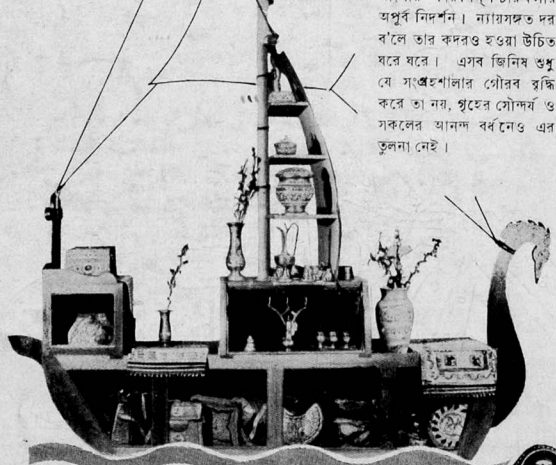

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত